সন্দেশ

নবম বর্ষ—দশম সংখ্যা | মাঘ ১৩৭৬/ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

শীত

করুণাময় বসু

শিউলি বনের শুভ্র হাসি ম্লান হয়েছে, শূন্য ফুলের ডালা ;
দূর আকাশে, সবুজ বনে, রোদের আলোয় কোন পটুয়ার
রঙ ফেরাবার পালা।
সকাল বেলা শিশির ভেজা ঘাসে
টাপুর টুপুর মুক্তোগুলি নোলক হয়ে হাসে
ঝাউ বাগানে ঝিরঝিরিয়ে কচি রোদের আলো
মিষ্টি হয়ে পড়ছে ঝরে, তুতুল, বুতুল সবার চোখে
লাগছে বড়ো ভালো।
পেয়রা বনে দেখি
কাঠ বিড়ালী দুহাত তুলে ডাকছে কাকে, একী !
চাঁপা বরণ ওড়না গায়ে ফুলের মতো কোন মেয়েটি
মাঠের মাঝে, ক্ষেতের মাঝে ঘোরে,
নতুন দিনের স্বপ্ন চোখে নতুন কালের সূর্য ওঠা ভোরে !

ঝাপসা এখন নদীর চর ঃ মাঠের ধারে নানা রঙের দূর বিদেশী
একটুখানি থেমে যাওয়া পান্থ-পাখির মেলা ;
গাছের ছায়া, বনের মায়া আপন মনে মিলিয়ে গেল
শান্ত বিকেলবেলা।
নাম না জানা আঁকন বুড়ো লেখন তুলি ঝোলায় তুলে রেখে
ছবি আঁকা শেষ করে সে মুচকি হেসে মেঘের দেশে
হারিয়ে গেল স্বপ্নটুকু এঁকে।
কাঁঠাল বনে একটু পরে উঠবে জানি ঝিলমিলিয়ে ছোট্ট চাঁদের কণা,
ঘুম কাতুরে তুতুল, বুতুল বলবে মাকে,
অচিন দেশের রূপকথাটি শোনা।

ধারাবাহিক উপন্যাস

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলে, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এঁরা এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিস-বাসীদের বংশধর। বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন। কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা। তাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রগর্ভের বহু বিচিত্র, ভয়াবহ এবং অদ্ভুত দৃশ্যের কথা জানতে পারল। সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল 'প্রভু ঘোর দর্শনের সঙ্গে পরিচয়। অমর এবং অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তিটি সমস্ত আটলাণ্টীয় সভ্যতা ধ্বংস করতে বদ্ধ-পরিকর। তাদের মৃত্যুলিপি তিনি ম্যারাকটদের হাতেই পাঠালেন।)

(চৌদ্দ)

এর মধ্যে একটা সেই নীলচে লাল রঙের শামুক স্ক্যানল্যানের গা বেয়ে তার কাঁধের উপর এসে উঠেছিল। সেটাকে ফেলে দিয়ে সবাই সেই ভয়ানক জায়গা ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। সেখানে পা দেওয়ার মত কুবুদ্ধি আমাদের কেন হয়েছিল বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল। যা হোক যখন সেই আধ অন্ধকার জায়গা থেকে বেরিয়ে আবার সমুদ্রের অনুপ্রভার আলোয় এসে পৌঁছালাম, চারিদিকে আবার স্বচ্ছ জল দেখতে পেলাম

তখন মনটা একটু হালকা মনে হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। প্রফেসর আর আমি দুজনেরই যেন মুখে আর তেমন কথা যোগাচ্ছিল না, কেবল স্ক্যানল্যানই দেখলাম তখনও দমেনি। সে বললে, 'এইবার এর সঙ্গে আমাদের টক্কর লাগল। বোধ করি ও আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। বড় বড় গুণ্ডারা ওর কাছে এক কানা কড়িও নয়। এখন কথা হচ্ছে কি করে ওকে বাগে আনা যায়।'

"ডাঃ ম্যারাকট্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তার পর ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের সেই হলদে পোষাক পরা পরিচারককে ডাকলেন। সে আসতে বললেন, 'মাণ্ডা'। একটু পরে মাণ্ডা এসে ঘরে ঢুকলেন। ম্যারাকট্ তাঁর হাতে সেই সাংঘাতিক চিঠিখানি দিলেন।

"সেই সময়ে আমি মনে মনে মাণ্ডার যেমন প্রশংসা করেছিলাম তেমন আর কখনও কারও করিনি। আমরা তাঁদের কেউ নই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। সেই আমরা আমাদের অন্যায় কৌতূহলের ফলে তাঁদের গোটা জাতটার এবং তাঁর নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। সেই লেখাটুকু পড়তে পড়তে তাঁর মুখ মরার মুখের মত পাঙাশ হয়ে গেল। তবু, যখন তিনি তাঁর বিষাদভরা পিঙ্গল চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকালেন সেই চোখে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখলামনা। আস্তে আস্তে কেবল মাথা নাড়লেন, মনে হল নিদারুণ নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। 'বেঅ্যাল্-সীপা! বেঅ্যাল্-সীপা!' বলে তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। দুই হাতে দুই চোখ চেপে ধরে যেন কোনো ভয়ানক দৃশ্য থেকে চোখ আড়াল করতে চাইলেন। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে খানিক পায়চারি করে' শেষে সমাজের সকলকে সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনাবার জন্য ছুটে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই আমরা শুনতে পেলাম সেই বিপুল ঘণ্টাধ্বনি সবাইকে প্রেক্ষাগৃহে আহ্বান করছে।

"আমি শুধোলাম. 'আমরা যাব!'

"ডাঃ ম্যারাকট্ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমরা কি করতে পারি? আর ওরাই বা কি করতে পারে? দানবের মত যার ক্ষমতা তার কাছে ওরা কি?'

"একটা বেড়ালের কাছে একপাল ইঁদুর যা, তাই,' বলে' উঠল স্ক্যানল্যান্ 'কিন্তু উপায় একটা আমাদের বের করতেই হবে। সাধ করে' শয়তানকে ডেকে এনে শেষে তাকে আমাদের উপকারী বন্ধুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়তে আমরা পারি না বোধ হয়।"

"আমি উৎসাহিত হয়ে শুধোলাম, 'তুমি কি বল? স্ক্যানল্যানের ঠাট্টা তামাশা হালকামোর আড়ালে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আধুনিক যন্ত্রকুশল মানুষের তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি।

'সে বললে, 'হয়ত এই মহাত্মাটি নিজেকে যত নিরাপদ মনে করেছেন ঠিক তা তিনি নন।'

'তুমি ভাবছ আমরা তাকে আক্রমণ করলে কেমন হয়?'

'ডকটর বলে উঠলেন, 'পাগল!'

'স্ক্যান্ল্যান্ তার দেরাজের কাছে গেল! তারপর আমাদের দিকে ফিরতে দেখি তার হাতে একটি বড় ছয়ঘরা রিভলভার।

'সে বললে, এটিকে কেমন মালুম হয়? জলে ডোবা জাহাজটাতে যখন আমরা ঢুকেছিলাম তখন আমি এইটি জোগাড় করি। একডজন গুলি আছে, ততগুলিই ছেঁদা যদি করে দিই ঐ কড়া জানওয়ালা মহাত্মাটির গায়ে তাহলে তাঁর খানিকটা ভেলকি বেরিয়ে যেতেও পারে।.....হা ভগবান্,বাঁচাও আমায়! একী!'

'রিভালভারটা ঝন ঝন করে মেঝের উপর পড়ে গেল আর স্ক্যান্ল্যান্ বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের

কবজিটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল। তার সমস্ত ডান হাতটায় সাংঘাতিক রকমের খিল ধরে' গিয়েছিল, হাতের পেশীগুলি যেন গাছের শিকড়ের মত শুলি পাকিয়ে উঠেছিল। বেচারার কপাল বেয়ে কাল ঘাম ছুটল। একেবারে কাহিল আর বেদম হয়ে সে তার বিছানায় এসে পড়ল।

*বললে, 'নাঃ, পটকে গেলাম।···ধন্যবাদ, ব্যথাটা একটু কমেছে। কিন্তু উইলিয়ম স্ক্যান্‌ল্যান্‌ নক্‌ আউট খেয়ে গেল। যা হোক আমার শিক্ষা হল। ছয়-ঘরা রিভলভার নিয়ে জাহান্নমের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ওকে ওস্তাদ কবুল করছি।'

"ম্যারাকট বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার শিক্ষা হয়েছে, বড় কঠিন শিক্ষা।'

'তাহলে আপনি মনে করেন আমাদের কোনো আশা নেই?'

'আমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যখন সে জানতে পারছে তখন আর আমরা কি করতে পারি? কিন্তু তবু আমরা হাল ছাড়ব না।' এই বলে তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, 'স্ক্যান্‌ল্যান্‌, তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেই বোধহয় ভাল। যে ধাক্কাটা তোমার উপর দিয়ে গেল সেটা সামলে উঠতে কিছু সময় লাগবে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ তবু দমেনি, বললে, 'যদি কিছু করবেন বলে ঠিক করেন তাহলে আমিও সঙ্গে আছি জানবেন। তবে গায়ের জোর ফলানোটা বোধহয় বাদই দিতে হবে।' তখনও তার মুখের চেহারা আর হাত পায়ের কাঁপুনি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে কি যন্ত্রণা সহ্য করেছে।'

'তোমার কথা ধরলে বলি কিছুই করব বলে ঠিক করিনি। কিছু করবার ভুল উপায়টা কি সেটুকু অন্ততঃ আমরা শিখলাম। যেমন ভাবেই হোক জোর খাটানো বৃথা। আমাদের শত্রু কাজ করছে চেতনার অন্য এক স্তরে—সেটা আত্মিক স্তর। হেডলে তুমি এইখানেই থেকো। আমি আমার স্টাডিতে যাচ্ছি, একলা থাকলে হয়ত কিংকর্তব্য বুঝতে পারব।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ আর আমার দুজনেরই ম্যারাকটের উপর অসীম নির্ভরতা জন্মেছিল। মানুষের বুদ্ধিতে যদি আমাদের মুশকিল আসান হয় তাহলে তাঁর বুদ্ধিতেই হবে।

অথচ এও ঠিক যে আমরা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে মানুষের কোনও ক্ষমতা খাটে না। যে অলৌকিক শক্তির আমরা কোনো কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না তার কাছে নিজেদের শিশুর মতই অসহায় মনে হচ্ছিল।

স্ক্যান্‌ল্যান্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সে আরাম পাচ্ছিল না। আমি পাশে বসে কেবল ভাবছিলাম একটি কথা। সেটা এ নয় যে কি করে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব, বরং ভাবছিলাম সে বিপদ কখন কি ভাবে দেখা দেবে। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশকে তুচ্ছ করে এতদিন যারা বেঁচে ছিল এইবার যে কোনও মুহূর্তে হয়ত তাদের শেষ দশা এসে উপস্থিত হবে—আর তাদের সঙ্গে আমাদেরও। হয়ত আশ্রয়সদনের ছাদ ধ্বসে যাবে, হয়ত দেওয়াল পড়ে যাবে। এতদিন যে জলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই জল চারিদিক থেকে ঘিরে আসবে।

'হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে। সে আওয়াজ শুনে বুকের ভিতরটা যেন কিরকম করে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম, স্ক্যান্‌ল্যান্‌ও বিছানায় উঠে বসল্‌। ঘণ্টা যেন পাগলের মত বেজে চলেছিল তার সেই একরোখা ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন উপায় নেই।

'স্ক্যাল্‌ল্যান্‌ বললে, এই ধর গিয়ে ইয়ার, এবার বোধ হয় তার সঙ্গে ওদের টক্কর লাগল, আমাদের উচিত হচ্ছে ওদের কাছে যাওয়া।'

'কিন্তু আমরা গিয়ে কি করব?'

'এই ধর আমাদের দেখেও তো ওরা কিছুটা সাহস পাবে। মোদ্দা, ওরা যেন না মনে করে যে আসল সময়টিতে আমরা কেটে পড়েছি। ডক্ কই?'

'তিনি তাঁর স্টাডিতে গেছেন। তুমি ঠিকই বলেছ, বিল্, আমাদের ওদের কাছে যাওয়াই উচিত, ওরা যাতে বুঝতে পারে যে আমরা ওদের অদৃষ্টের ভাগ নিতে প্রস্তুত।'

'বেচারারা যেন আমাদের উপরেই নির্ভর করতে চায় মনে হয়। হতে পারে ওরা আমাদের চাইতে বেশী জানে, কিন্তু আমাদের ছাতির জোর বোধ হয় বেশী। তারা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছিল সেইটুকুই হয়ত নিয়েছে, আর আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের নিজেদের খুঁজে বের করতে হয়েছে। যাক্, আমি বলি আসুক প্রলয়—যদি প্রলয় আসতেই হয়।'

'কিন্তু আমরা দরজার দিকে এগোতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম: ডাঃ ম্যারাকট এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন—কিন্তু আমরা যে ডাঃ ম্যারাকটকে জানতাম ইনিই কি তিনি? সেই শান্ত পণ্ডিত কোথায় অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর জায়গায় দেখা দিয়েছেন একজন অতিমানব। এক মহান্ নেতা, একটি অমিততেজা আত্মা যিনি মানব জাতিকে গড়ে নিতে পারেন আপন ইচ্ছানুযায়ী। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় যেন শক্তি ও সংকল্প ফুটে উঠেছে।

'বললেন, 'হ্যাঁ, এখনও হয়ত সময় আছে। কিন্তু এখনই এস, হয়ত আর রক্ষা থাকবে না। সমস্ত আমি পরে বুঝিয়ে বলব—যদি 'পরে' বলে আমাদের কিছু থাকে।.....হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি।'

'শেষের কথা কয়টি বললেন কয়েকজন আটলাণ্টীয়ের উদ্দেশে। তারা দরজার কাছে এসে ব্যাকুলভাবে আমাদের ইশারা করছিল যেতে। আমরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সামনের সারিতে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে যে চাপা গুঞ্জন উঠল তাতে বুঝলাম মনে মনে সকলেই এরই মধ্যে একটু আরাম পেয়েছে ভরসা পেয়েছে।

'সত্যিই আমাদের দ্বারা যদি কোনো সাহায্য হয় তবে এই তার সময়। কারণ দেখলাম সেই ভীষণ সুপুরুষ প্রভু ঘোরদর্শন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, মহাভয়ে কাতর জনতার দিকে চেয়ে তার চাপা ঠোঁটে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছে। এ দৃশ্য দেখে স্ক্যানল্যানের সেই বেড়াল আর ইঁদুরের উপমা আমার মনে পড়ল।

আটলাণ্টীয়রা এ ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল আর ত্রাসে বিস্ফারিত চোখে সেই শক্তিমান্ মূর্তির নির্দয় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মুখ যেন গ্র্যানাইট পাথর কুঁদে তৈরী। মনে হল তার মুখ থেকে শেষ কথা এদের শোনা হয়ে গেছে। মাণ্ডা তখনও দীনভাবে সকলের হয়ে দু এক কথা বলবার চেষ্টা করছিলেন। তাতে সেই পিশাচের মুখে নির্মম বিদ্রূপের ভাব আরো জমাট বাঁধছিল।

শেষে মাণ্ডাকে থামিয়ে দিয়ে সে ডান হাতখানা শূন্যে তুললে। সকলে তীব্র হতাশায় চীৎকার করে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ম্যারাকট লাফিয়ে মঞ্চের উপর উঠলেন। তাঁর দিকে চেয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর চলন আর ভাবভঙ্গী যুবকের মত সহজ ও সতেজ, আর তাঁর মুখে এমন এক শক্তির ছাপ যা আমি মানুষের মুখে কখনও দেখিনি। তিনি দৃঢ় পদে সোজা সেই দৈত্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে অবাক হয়ে তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল।

'বললে, 'কিহে কি বলবার আছে তোমার?'

'ম্যারাকট বললেন, 'আমার এই বলবার আছে যে তোমার দিন ফুরিয়েছে, তুমি নিপাত যাও! নরক তোমায় জন্য অপেক্ষা করছে নেমে যাও সেইখানে। তুমি অন্ধকারের রাজা, অন্ধকারের দেশে যাও।'

'দানবের চোখে আগুন ছুটতে লাগল। সে বলল আমার দিন যদি কখনও ফুরায় তখন মরণশীল মানুষের মুখে আমায় সে কথা শুনতে হবে না। প্রকৃতির গোপন রহস্য আমার মুঠোর মধ্যে। তোমার কি ক্ষমতা আছে যে আমার সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পার? তোমায় এখনি ভস্ম করে ফেলতে পারি।'

'ম্যারাকট স্থির দৃষ্টিতে তার সেই ভয়ঙ্কর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল দানবই চোখ ফিরিয়ে নিলে।

'আমি তোমাকে ভস্ম করে ফেলতে পারি। পৃথিবীকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল তা তুমি নষ্ট করেছ, তুমি বিদায় হলে মানুষের মনের ভার কমবে, সূর্যের আলো আরো উজ্জ্বল হবে।'

'একি! কে তুমি? এ তুমি কি বলছ?' দানবের মুখে কথা আটকে যেতে লাগল।'

'তুমি কি জান না কি বলছি? যে স্তরেই হোক ভাল সব সময়েই মন্দের চেয়ে বলবান্। তুমি এতকাল যে স্তরে রয়েছ আপাততঃ আমিও সেই স্তরে, সেই স্তরের যা ভাল তারই শক্তি আমার মধ্যে। আবার বলি: নিপাত যাও! তুমি নরকের জীব, নেমে.যাও সেইখানে। যাও, চলে যাও! নিপাত যাও!'

একটুক্ষণ সেই দুই সত্তা— মানব আর দানব— পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। তার পর দানব হঠাৎ তার চোখ ফিরিয়ে নিলে। রাগে তার মুখ বিকৃত হল। দুই হাত শূন্যে কি যেন আঁকড়ে ধরতে চাইলে। চীৎকার করে বলল, 'বুঝেছি-এ আর কেউ নয়; ও আচ্ছা, এ তুমি! এ তোমার কাজ। ওঃ ওথার্জ, তোমার উপর আমার অভিশাপ রইল, আমার অভিশাপ রইল।'

তখন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। ঘোরদর্শনের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তার শরীরটা যেন ঝাপসা দেখাতে লাগল, মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙ্গে পড়ল, আস্তে আস্তে সে নিচু হয়ে যেতে লাগল। একটু পরে আর তাকে যেন মানুষ বলে চেনা গেলনা। আর একটু পরে দেখলাম সে আর নেই, তার জায়গায় কেবল কালো কালো নোংরা এক তাল কাদা। তার গন্ধে বাতাস বিষিয়ে উঠল।

'হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনে চেয়ে দেখলাম ডাঃ ম্যারাকট টলছেন, এখনই পড়ে যাবেন। স্যান্‌ল্যান্ আর আমি ছুটে গেলাম মঞ্চের উপর। তখন তিনি অস্ফুট স্বরে কেবল বলছেন; 'আমাদের জিত! আমাদের জিত!' তার পরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

এমনি করে আটলাণ্টীয় উপনিবেশের সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ চিরদিনের মত দূর হল। ডাঃ ম্যারাকট কয়েকদিন কিছুই বলতে পারলেন না। তারপরে যখন সব কথা বললেন তখন সেটা এতই অদ্ভুত লাগল যে সমস্ত ব্যাপারটা যদি আমাদের চোখের সামনে না ঘটত তাহলে তাঁর কথাগুলিকে তাঁর অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ বলেই ধরে নিতাম। আগেই বলে রাখি যে প্রভু ঘোরদর্শনের সম্মুখীন হবার সময়ে ডাঃ ম্যারাকটির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তার কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি আবার অন্তর্ধান করেছিল, এখন তিনি আবার আমাদের সেই চিরপরিচিত শান্ত আত্মসমাহিত বিজ্ঞানী।

'তিনি বললেন, 'আমারই কিনা এমনটা হল!'

আমি—এই নিছক বস্তুবাদী আমি, যার কাছে অদৃশ্য কোনো কিছুর দাম ছিল না! সারা জীবন দুনিয়াটাকে যেমন ভেবে এসেছি শেষে এখন দেখছি তাই সব নয়।'

'স্যান্‌ল্যান্ বললে, 'কেঁচে গণ্ডুষ! বোধকরি আমরা আবার সবাই পাঠশালে নাম লিখিয়েছি। যদি

কোনোদিন দেশে ফিরতে পারি সবাইকে বলবার মত কিছু হল বটে।'

'আমি বললাম, 'যত কম বলবে ততই কিন্তু ভাল—যদি না আমেরিকার সেরা মিথ্যুক বলে নাম কিনতে চাও। অন্য কেউ আমাদের এসব বললে কি আমরা বিশ্বাস করতাম?'

'হয়ত না। কিন্তু এই ধরুন গিয়ে ডক্, আপনি ঠিক দাওয়াই দিয়েছিলেন বটে। হুমদো দৈত্যটা সেই যে পড়ল, দশ গোনার মধ্যে আর উঠলই না। এমন পরিষ্কার নক্-আউট আমি আর দেখিনি।'

'ডক্টর বললেন, 'ঠিক একরকমটি হয়েছিল তোমাদের বলি। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে এসে আমার স্টাডিতে গেলাম। আমার মনে সামান্যই আশা ছিল। তবে এক সময়ে আমি ইন্দ্রজাল আর গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলাম। আমি জানতাম ভাল সব সময়েই মন্দকে জয় করতে পারে, কেবল যদি মন্দের সমান স্তরে উঠতে পারে। প্রভু ঘোরদর্শন আমাদের চাইতে অনেক উঁচু স্তরে ছিল। আমি তাই আর কোনো উপায় না দেখে কৌচের উপর বসে প্রার্থনা করতে সুরু করলাম। হ্যাঁ, আমি, এই ঝুনো বস্তুবাদী, প্রার্থনা করতে সুরু করলাম—সাহায্যের জন্য। মানুষ যখন আপন শক্তির শেষে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে ঘিরে আসে যে অনন্ত রহস্যময় শূন্য তার দিকে দুটি অসহায় হাত বাড়িয়ে সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া সে আর কি করতে পারে?'

'হঠাৎ দেখলাম ঘরের মধ্যে আমি একা নই। আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাকার পুরুষ, প্রভু ঘোর-দর্শনের মতই ঈষৎ ঘোরবর্ণ, দাড়িতে ঘেরা মুখখানি কিন্তু করুণা ও সকলের মঙ্গল কামনায় যেন আলো হয়ে রয়েছে। যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর মধ্যে যে শক্তি আছে সেও সেই দানবের শক্তির মত, কিন্তু তা পুণ্যের শক্তি। আমার মুখে কথা ফুটল না, অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ভিতর থেকে কে যেন বললে, ইনিই সেই মহাজ্ঞানী আটলান্টীয়ের দেহ-বিমুক্ত আত্মা যিনি সমস্ত দেশটাকে আর তার সেরা মানুষদের বাঁচাবার উপায় করেছিলেন যদিও দেশশুদ্ধ তাঁরা সকলেই ডুবে যান অতল সমুদ্রে।

হঠাৎ যেন আশার এক বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে এইসব আমার মনে এসে দেখা দিল—এমন স্পষ্টভাবে যেন তিনিই সে সব আমায় বললেন। আমার কাছে এসে তাঁর দুটি হাত রাখলেন আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম তাঁর পুণ্যের শক্তি যেন পবিত্র অগ্নিশিখার মত আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। তখন পৃথিবীতে কিছুই আর অসম্ভব মনে হলনা। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঘণ্টা বাজছে, চরম সময় উপস্থিত। আমি কৌচ থেকে উঠতেই সেই আত্মা অপরূপ হাসি হেসে আমায় উৎসাহ দিয়ে অন্তর্ধান করলেন। তারপর আমি এসে তোমাদের সঙ্গে মিললাম। বাকিটা তোমরা জান।'

'আমি বললান, 'আপনি যেমন অলৌকিকভাবে সকলকে রক্ষা করলেন তাতে ইচ্ছা করলে এখানে একজন দেবতা হয়েই আসতে পারেন।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ একটু মুখ ভার করে বললে, 'আপনি তো বেশ পার পেয়ে গেলেন, ডক্। আপনি কি করছেন না করছেন তা সেই মহাপ্রভুটি টের পেল না কেন! আমি যখন পিস্তল হাতে নিয়েছিলুম তখন আমার উপর হামলা করতে তো তার একটুও দেরি হয়নি।'

'ডক্টর একটু ভেবে বললেন, 'সেটা হয়ত এইজন্য যে তুমি ছিলে বস্তুর স্তরে আর আমি তখনকার মত ছিলাম আত্মার স্তরে। এমনি সব ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা হয়। আমি যে শিক্ষা পেলাম তা যেন আমার জীবনকে সার্থক করে।'

'এই হল আমাদের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার উপসংহার। এর অল্প দিন পরেই উপরের পৃথিবীতে আমাদের খবর

পাঠাবার কল্পনা আমাদের মাথায় আসে। শেষে লাঘবজান গ্যাসে ভরা কাঁচ গোলকের সাহায্যে আমরা উপরে উঠে এলাম তা তো এখন সকলেই জানেন। ডাঃ ম্যারাকট মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। মৎসবিদ্যার কি একটা বিষয়ে তিনি আরো একটু বিশদ তথ্য চান! তবে স্ক্যান্‌ল্যান্ শুনছি ফিলাডেলফিয়ায় তার সখী সেই জাহাজী মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। সে এখন মেরিব্যাঙ্কস্-এর ওঅর্কস্ ম্যানেজার। আর আমার কথা যদি বলতে হয়, সমুদ্র আমাকে যে অমূল্য রত্ন দিয়েছে তাছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

শেষ

পুস্তক পরিচয়

—কল্যাণী কার্লেকার

আমাদের নাটক—হাসি দাশগুপ্তা

পরিবেশক—বাণীরূপ, ৫।১, রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯।

দাম ৩৲

বইটা "ছোটদের একাংক নাট্যমালা"। এতে পাঁচ থেকে সাত, ছয় থেকে আট, আট থেকে দশ আর এগারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেপিলেদের জন্য চারটি নাটক আছে। এগুলি চিত্তাকর্ষক আর শিক্ষামূলক,—যারা অভিনয় করবে তারা আনন্দ পাবে, পরকে আনন্দ দেবে আর সকলেও কিছু কিছু শিখবে।

লেখিকা শিক্ষকশিক্ষণপ্রাপ্তা এবং শিক্ষিকাশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত বলে সুন্দরভাবে বয়সের উপযোগিতা বিচার করতে পেরেছেন। প্রয়োগকারিদের এতে সুবিধা হবে।

লেখিকার সাহিত্য প্রতিভা অবিসংবাদিত। বইয়ের চেহারা যত সুন্দর করা হয়েছে ছাপার ভুল এড়াবার দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। প্রথম অংশে ছাপার পরেকার সংশোধনের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু শেষদিকের ভুলগুলি রয়ে গেছে।

মাছ, ব্যাং ও কীট পতঙ্গের সন্তান বাৎসল্য

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে—মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক কি ? বিভিন্ন জাতের স্ত্রী-মাছের ডিম থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি করে বাচ্চা হয়ে থাকে। সংখ্যাধিক্যের জন্যেই মায়ের সঙ্গে বাচ্চাদের কোনই সম্পর্ক থাকে না। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে মা তার বাচ্চাগুলিকে শিকার করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে থাকে। কাজেই 'মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক !'—কথাটার প্রচলন হয়েছে।

কিন্তু কথাটা অনেকাংশে সত্য হলেও এর কতকগুলি অদ্ভুত ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তোমরা যাতে নিজের চোখে লক্ষ্য করতে পার, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের কয়েকটি অতি পরিচিত সাধারণ মাছের সন্তান বাৎসল্যের কথা বলছি।

চেতল মাছ হয়তো তোমাদের সকলেরই পরিচিত। বড় বড় অনেক পুকুরে চেতল মাছ জন্মায়। এরা পুকুরের ঘাটলার ফাটল বা জলের তলার কোন আবর্জনার আড়ালে ডিম পেড়ে সর্বদা কাছে কাছে থেকে পাহাড়া দেয়, যাতে কেউ ডিম চুরি করতে না পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর অন্যান্য মাছ—এমনকি, মানুষও যদি ওদের বাচ্চার কাছাকাছি গিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে ইতস্ততঃ করে না। বাচ্চাগুলি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মা বাচ্চাদের ছেড়ে কখনও দূরে সরে যায় না।

আড় মাছ তোমাদের অপরিচিত নয়। আমাদের দেশে দিঘি, পুকুরের গভীর জলের তলায় বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। পুরুষ মাছটা গর্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর বেশ একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-মাছটা গর্ত ছেড়ে কোথাও যায় না। বাচ্চা ইঞ্চি-খানেক বড় হবার পর স্ত্রী-মাছটা সময়ে সময়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও বারবার ঘুরে এসে বাচ্চাগুলিকে তদারক করে যায়। গুরুতর কোন বিপদের আশঙ্কা ঘটলে বাচ্চাগুলি মায়ের প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেলে মা তার মুখ হাঁ করে রাখে। বাচ্চাগুলি তখন মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় গর্তের মধ্যে গিয়ে একসঙ্গে অবস্থান করে।

ব্যাং তোমরা সবাই দেখেছ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কুনো ব্যাং, সোনা ব্যাং, কোলা ব্যাং বা ছ্যাচ্ছেড়ে ব্যাং প্রায় সর্বদাই নজরে পড়ে। তাছাড়া কয়েক রকমের পাণ্ডু রঙের ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যাং ও

বড় গেছো ব্যাংও দেখা যায়। ব্যাং সাধারণতঃ জলের মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। বাচ্চাদের কোন খবরই নেয় না। কিন্তু কয়েক জাতের ব্যাং আছে, যেমন সুরিনাম ব্যাং—এরা ডিম থেকে বাচ্চা হবার পর সেগুলিকে পিঠের উপর ছোট ছোট পকেটের মত গর্তের মধ্যে রেখে প্রতিপালন করে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলি পিঠ ছেড়ে কোথায় যায় না। ধাত্রী ব্যাং নামে এক রকমের ব্যাং আছে, এদের স্ত্রী-ব্যাং পুরুষ ব্যাঙের পিছনের পায়ে ও কোমরের চারদিকে লালায় তৈরি সুত্রের সাহায্যে তাদের ডিমগুলিকে জড়িয়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ব্যাং তাদের বয়ে নিয়ে বেড়ায়—এবং ডিম ফোটবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আমাদের দেশের গেছো ব্যাংগুলিও সন্তান পালনের জন্যে অদ্ভুত এক রকম কৌশল অবলম্বন করে। জলের কিছু উপরে ঝুলন্ত পাতার ডগার সঙ্গে থুথু দিয়ে ডেলার মত বড় বড় গোলাকার বাসা তৈরি করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। বাইরের দিকটা শুকিয়ে গিয়ে বেশ শক্ত একটা আবরণ তৈরি হয়ে যায়। তার মধ্যে তারা ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি বেশ কিছুটা বড় হবার পর থুথুর বাসার পর্দা ভেদ করে জলে পড়ে এবং দু-চার দিনের মধ্যেই ব্যাঙাচির জীবন শেষ করে ছোট ছোট ব্যাঙের আকৃতি ধারণ করে।

তোমাদের অনেকেই হয়তো ক্যাঙ্গারু ও অপোসামের সন্তান পালনের অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা শুনে থাকবে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ক্যাঙ্গারু তার বাচ্চাকে পেটের থলিতে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। অপোসামের ৫।৬ করে বাচ্চা হয়। অপোসাম তার লম্বা লেজটাকে পিঠের উপর হেলিয়ে দেয়—এবং বাচ্চাগুলি তাদের লেজের সাহায্যে মায়ের লেজটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পিঠের উপর অবস্থান করে। এভাবে বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়েই অপোসাম গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের চেয়ে অনেক নীচু পর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যে সন্তান পালনের অনুরূপ ব্যবস্থা দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

কাঁকড়াবিছা তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছ। কাঁকড়াবিছার লেজের প্রান্তভাগে বঁড়শীর মত খানিকটা বাঁকানো একটা হুল থাকে। এই হুলের দংশন খুবই যন্ত্রণাদায়ক। একবারে এদের ২৫।৩০টা করে বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলি বেরিয়ে এসেই মায়ের পিঠের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। মা বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়েই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠ ছেড়ে কোথাও যায় না।

আমাদের দেশের খালে-বিলে, বাদামী ও চিতি কাঁকড়ার অভাব নেই। একটু খোঁজ করলেই তোমরা অনায়াসে এই কাঁকড়া দেখতে পাবে। বর্ষার সময় এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি মায়ের বুকের ঢাকনাওয়ালা একটা গর্তের মধ্যেই থাকে। ডিম থেকে বাচ্চা বেরুবার পর সেগুলি ঢাকনাটার নীচেই অবস্থান করে। জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা মায়ের বুক ছেড়ে কোথাও যায় না। বাচ্চাগুলিকে বুকে নিয়েই স্ত্রী-কাঁকড়া অনায়াসেই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে থাকে। চিংড়িরাও ডিম বুকে নিয়ে যেখানে সেখানে বিচরণ করে থাকে। তবে ডিম নিয়ে বেড়াবার সময় কখনও এরা জলের বাইরে যায় না।

গরু, ছাগল, গাধা প্রভৃতি জন্তুদের প্রবল সন্তান-বাৎসল্যের ব্যাপার তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখা যায় ধোপার গাধার ক্ষেত্রে। বাচ্চা সঙ্গে থাকলে মা খুব ভারী বোঝা নিয়েও অতি উৎসাহের সঙ্গেই গন্তব্যস্থলের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নিলেই তার চলা বন্ধ হয়ে যায়—কাঠের মত অচল অবস্থায় একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মারধোর করেও নড়ানো যায় না।

কয়েকজাতের মাকড়সার মধ্যেও তাদের ডিমের প্রতি এরূপ প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। আমাদের দেশে ঘরের আনাচে কানাচে বা দেয়ালের গায়ে সময় সময় ধূসর বর্ণের বড় মাকড়সাকে ডিম বুকে করে বসে থাকতে দেখা যায়। কাউকে কাছে আসতে দেখলেই চোখের নিমেষে কোন কিছুর আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু কোনরকমে ডিমের থলেটি ছিনিয়ে নিলে, সেটাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত স্থানত্যাগ করতে চায় না। এই জাতেরই আর একরকমের মাকড়সার ডিম ছিনিয়ে নিলে একই জায়গায় চুপটি করে বসে থাকে। এই অবস্থায় কাগজ বা সোলার ছোট্ট একটি ডেলা পাকিয়ে কাছে ধরলেই সেটাকে ডিমের মত করে আঁকড়ে ধরে নিয়ে ছুটে পালায়। শোনা যায় কোন গতিকে ডিম চুরি গেলে পেঙ্গুইন পাখীরাও নাকি বরফের ডেলা কুড়িয়ে তার উপর বসে দিনের পর দিন ডিমের মতই তা দিয়ে থাকে।

এবার আমাদের দেশের এক রকমের অদ্ভুত প্রকৃতির মাকড়সার কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। বর্ষাকালে নালা, ডোবা ও এঁদো পুকুরের ধারে ধারে জলজ ঘাসপাতার উপর প্রায় এক ইঞ্চি পরিমিত একরকমের কালো ও ধূসর রঙের মাকড়সাকে অনবরত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ মাকড়সাদের গায়ের রং কালো ও স্ত্রী মাকড়সাগুলির গায়ের রং ধূসর এবং তারা পুরুষ মাকড়সাদের চেয়ে আকারে কিছুটা বড় যৌন মিলনের পর এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাটাকে আক্রমণ করে বেমালুম চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। স্ত্রী-মাকড়সার আক্রমণ থেকে কদাচিৎ দু-একটা পুরুষ মাকড়সাকে পালিয়ে বাঁচতে দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এরূপ ঘটনা তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। এই জাতের স্ত্রী-একসঙ্গে প্রায় ৬০।৭০টা ডিম পাড়ে। বড় মটরের মত একটা ফলের মধ্যে ডিমগুলিকে ভর্তি করে সেটাকে শরীরের পশ্চাৎভাগে আটকে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি বেরিয়ে এসে মায়ের পিঠের উপরই আশ্রয় গ্রহণ করে। স্ত্রী-মাকড়সাটা অতগুলি বাচ্চাকে পিঠে করেই স্বচ্ছন্দ গতিতেই শিকারের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য একটু শব্দ হলে অথবা অন্য কোন রকম ভয়ের কারণ ঘটলেই পিঠের বাচ্চাগুলিকে নিয়েই জলের নীচে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করে। জলের নীচে জলজ লতাপাতা আঁকড়ে ধরে প্রায় ১০।১২ মিনিট লুকিয়ে থাকবার পর আবার বাচ্চাগুলিকে নিয়ে জলের উপরে উঠে আসে। তোমার চোখের সামনেই হয়তো একটা মাকড়সা বাসা পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার নজরে থাকলেও হঠাৎ একটু শব্দ করলেই দেখবে—চোখের নিমেষে কোথায় যে সেটা জলের নীচে গিয়ে আত্মগোপন করলো—কোনো রকমেই তার হদিশ পাবে না।

আমাদের দেশে খাল-বিল ও বন জঙ্গলে এছাড়া আরও অনেক রকমের পোকামাকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাদি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টণ্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রাণ্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তিনিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।)

॥ ৪ ॥

—হ্যালো হ্যালো ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। জবাব দাও। হ্যালো জবাব দাও। বল। হ্যালো-বল।

রেডিও অফিসার হোলখ্ কান থেকে হেড ফোন নাবাল।

—না সার কোনই সাড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না।

—সর্বনাশ। বললেন প্রেসিডেণ্ট ব্রকেনসিল।—এখন কি করা উচিত ?

দাড়ি চুলকে আরডন বললেন।—প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে আহতদের কথা। ভ্লাচ্ছা ডাক্তার ওদিকের সাথে কথা বলে আপনি কি বুঝলেন ?

ডাক্তার কিটিসোলা তাঁর টাক মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন।

—ভয় ঐ গুরুদিৎকে নিয়ে সুধু। মনে হয় ওর মাথায় চোট।

ওকে এখুনি সরান উচিত। বাকি দুজনের আঘাত বেশী হলেও ওরাই সামলাতে পারবে।

—আপনি নাববেন জঙ্গলে? স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—হ্যাঁ রাজি। বললেন ডাক্তার কিটিসোলা।—কিন্তু গ্রাটেনকোর শেষ কথাগুলো একবার ভাববেন। শেষে হিতে বিপরীত না হয়।

—না না। ব্যস্ত হয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।—জঙ্গলে এখন কাউকে নাবান ঠিক হবে না। শয়তান গ্রাটেনকোকে বিশ্বাস নেই। অনায়াসেই একটা ভয়ানক কিছুও করে বসতে পারে।.....ভীষণ চিন্তিত ভাবে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি সুরু করলেন তিনি। হোলখ্ বলল—রেডিও যোগাযোগ করার চেষ্টা কিন্তু আমরা সমানেই করে চলবো। মনে হচ্ছে জোর করে ওদের যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না গ্রাটেনকো। জেনারেল আরশ্চেনো বললেন—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। ও বোধ হয় ওদের বন্দী করে রেখে নিজে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চায়।

—হুঁ! গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন প্রেসিডেন্ট।

—কিন্তু তেমন পরিস্থিতি হলে আমাদের কি করা উচিত? মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও।—ভীষণ চিন্তিত ভাবে ঘর ময় আবার পাইচারি সুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। একটু থেমে বললে—জরুরী মন্ত্রীসভার অধিবেশন ডাকা উচিত এখুনি এই মুহূর্তে এখানে। আপনার কি মত জেনারেল?

আমারও ঠিক তাই মত প্রেসিডেন্ট।—আমার সেনা-বাহিনীর এ ক্ষমতা আছে যে ঐ মাজিনকোর সমস্ত জঙ্গলটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে শয়তানকে বন্দী করতে পারে। কিন্তু তাতে এ নিশ্চয়তা কই যে ঐ বিদেশী শিশুরা নিরাপদ থাকবে? শক্তি নয় প্রেসিডেন্ট এখন বুদ্ধির লড়াইয়ে ওকে হারাতে হবে।

আরডন চিন্তিত ভাবে বললেন—কিন্তু একটা বিপদের কথা মনে রাখতে হবে—কিকু বা হকোর দলের সাথে যদি হঠাৎ গ্রাটেনকোর দেখা হয়ে যায় তবেতো সমুহ বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের আগে ভাবা উচিত।

—কি করতে চান আপনি। চিন্তিতভাবে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন—চকৃমির তাকে মিডিকে আর কিকু আর হফোকে এখুনি রেডিও মারফৎ হুকুম দেব তারা কোন অবস্থাতেই দিনের বেলা চলাফেরা করবে না। যত কষ্টই হোক রাতের অন্ধকারে তাদের চলতে হবে। রেডিও যোগাযোগ রাত বারটার পর এক ঘণ্টা মাত্র। বাকি সময়ে বন্ধ। যাতে গ্রাটেনকো কোন রকম সন্দেহ না করতে পারে।

—আপনার কি মত জেনারেল?

নিখুঁত পরিকল্পনা। উত্তর দিলেন জেনারেল।

হোলখ্ বলল—আমি তাহলে খবরটা এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ। দিন। বললেন আরডন। আর বিশেষ করে মিডিকে বলুন সে যেন তার জিনিসপত্র বাইরে না বার করে দিনের বেলায়। আলোয় চকচক করলে গ্রাটেনকোর চোখে পড়তে পারে। বিশেষ সাবধানতা নেয় যেন সে। তাছাড়া সারা দিন তার প্রধান কাজ হবে সমস্ত জঙ্গল তন্নতন্ন করে খোঁজা কোন বিশেষ জায়গায় ওদের ও খুঁজে বার করতে পারে কিনা। পারলে তা জানাবে রাত্রে।

হোলখ্ বলল—আচ্ছা আমি এখুনি একথা জানিয়ে দিচ্ছি। এর পরে আমি কেবল চেষ্টা করবো প্লেনের যাত্রিদের সাথে যোগাযোগ করতে।

হোলখ্ তার যন্ত্রের সামনে বসে—কাজ সুরু করে দিল।

জেনারেল বললেন—যদি মিডি সঠিক কোন খবর দিতে পারে তবে রাতের অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ার কথা ভেবে দেখতে হ'বে। তবে আমার মনে হয় আপাতত গ্রাটেনকোর সর্ত শোনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা—আর এর মধ্যে জরুরি, মন্ত্রীসভার কাজ সারা ছাড়া কোন কিছুই করার নেই আপাতত।

—হ্যাঁ। বললেন প্রেসিডেন্ট।—আপনার বিমান বাহিনীর কাউকে আমার জরুরী আদেশ নিয়ে এখ্‌নি রওনা হয়ে পড়তে বলুন। মাননীয় মন্ত্রীদের আসার ব্যবস্থাও করুন জেনারেল।

নিশ্চয়ই।—বললেন জেনারেল

হোলখ্‌ তখন যন্ত্রের সামনে বলে চলেছে।

—প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ। প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ!—ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ শোন।—বল।

—বড় আস্তে চলছিস তোরা। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো। এমন করে চললে পথেই রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারে বাঘের পেটে যাবি তোরা। তখন গ্রাটেনকোর বাবাও তোদের বাঁচাতে পারবে না।—নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল গ্রাটেনকো।

কপালের ঘাম ঝরে চোখের মধ্যে পড়ছে হামিদুলের। হাত যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবুও মুখ ফুটে একটু শব্দও কোরল না ও। ওর দিকে তাকিয়ে তমুক্কা কেঁকিয়ে উঠল।—এমন করে আর কত দূরে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে তোমরা ভাই; আমাকে এখানেই ফেলে রেখে যাও। তোমরা বাঁচ।

ধমকে উঠল বিলি—ওকথা আবার বলবে তো সত্যিই তোমাকে আমরা ফেলে দেব। তখন আবার হাতটাও ভাঙ্গবে কিন্তু বলে দিচ্ছি।

—পাগল ছেলের দল। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল তমুক্কা।

দ্বিতীয় স্ট্রেচারে গুরুদিৎ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ঝাঁকানির চোটে। ওখানে আছে মুংলি শকুন্তলা শান্তা আর রুক্মিণী! সমান পা ফেলে চলতে পারছে না ওরা।

পরের স্ট্রেচারের ভার নিয়েছে সব কজন বাচ্চা। ওরা কিন্তু ব্যাপারটাকে বেশ মজা বলেই ধরে নিয়েছে। চেঁচামেচি হট্টোগোল করে আমিনাকে প্রায় ভুলিয়েই রেখেছে তার ব্যথার কথা। ওরা কেউই কিন্তু এখনও বুঝতে পারে নি কি ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়ছে ওরা। মাঝে মাঝে ওদের হাসি চিৎকারে বিরক্ত গ্রাটেনকো গর্জন করে উঠছে। তাতে ভয় পেয়ে ওরাও থামছে বটে। তবে সে অল্প কিছুক্ষণের জন্যই।

পরমুহূর্তেই আবার ওদের চিৎকার, হাসি শোনা যাচ্ছে।

—থামো। হঠাৎ মুংলি চেঁচিয়ে সবাইকে হুকুম করল।—থামো সবাই। গুরুদিৎকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে।—ওর হুকুম শুনেই রাণা হাত তুলল।

তাই দেখে সবাই থামল। আস্তে স্ট্রেচার মাটিতে নাবিয়ে রেখে পাশে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে তখন সকলে।

গর্জন করে ফিরে দাঁড়াল গ্রাটেনকো।

—থামলি যে তোরা? কে তোদের থামতে বলেছে শুনি? লাফিয়ে ও বিলির সামনে দাঁড়াতেই বিলি বলল—তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাওনি গুরুদিৎ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে? থামতে আমাদের হবেই এখন। এমনকি পরেও অনেকবার।

—না। থামবি না তোরা? ধরা পড়বার জন্য গ্রাটেনকো তোদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে না। ওঠ সকলে। চলতে হবে এখুনি। ওঠ বলছি।

—না আমরা চলবো না এখন। স্পষ্ট করে উত্তর দিল বিলি।—আমরা চলবো আমাদের ক্যাপ্টেনের হুকুম পেলে।

সমস্ত মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল গ্রাটেনকোর। ক'মিনিট ও ভেবেই পেল না কি করবে। তারপরে দাঁত মুখ ভেংচে বলল—মরতে চাস তুই?

—হাঁ আমরা সবাই।—সে তো আগেই বলেছি।

সামনে এসে দাঁড়াল রাণা।—বার বার ওকথা বলছ কেন তুমি? ওতে আমরা আর ভয় পাব না।

হাতের স্টেনগানটাকে দুম দুম করে সামনের গাছের গুঁড়িতে বারকতক ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—কি ভেবেছিস তোরা? কি ভেবেছিস! গ্রাটেনকো কি তোদের মতন কতগুলো অপোগণ্ডকে ইঁদুরের মতন মারতে পারে না? পারে পারে—নেহাৎ একটা মতলব মাথায় এসেছে তাই। নইলে...উঃ উঃ।

কি আর বলবে গ্রাটেনকো তা ভেবেই পেল না।

মুংলি তক্ষুণি বলল—আমরা একবার ডাক্তারের সাথে কথা বলব এক্ষুনি। গুরুদিতের জন্য আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি যন্ত্রটা দাও।

—তোর হুকুমে নাকি।—মুখ আবার ভেংচাল গ্রাটেনকো।

—দিতেই হবে তোমাকে। শক্ত পায়ে এগিয়ে গেল মুংলি।

ঝপ করে স্টেন গানটা আবার বাগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো—আর এক পা এগোলেই তোকে গুলি করব। ঠিক গুলি করব।

কাউকে কেউ কিন্তু কোন হুকুম দিল না! তবুও ওরা সবাই এসে দাঁড়াল মুংলির পাশে।

এক মিনিট থামল ওরা। তারপর সবাই শক্ত পায়ে এগিয়ে চলল গ্রাটেনকোর দিকে।

তাই দেখে ভীষণ ভাবে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—খবরদার। ওর নাকের মাংসপেশী কুঁচকে গেল চোখ দুটো ছোট কুতকুতে হয়ে পড়ল। ভীষণ ভাবে হাঁপাতে লাগল ও। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।—একটা হিংস্র পশুর মতন দেখাতে লাগল ওকে।—তবুও কেউ ভয় পেল না। ধীরে ধীরে এগিয়েই চলল সকলে।

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে কেমন যেন শক্ত করে ফেলল গ্রাটেনকো। পরমুহূর্তেই ওর হাতের স্টেন-গানটা গর্জে উঠল—দুম্ দুম্ দুম্।

কান ঘেঁসে এক ঝাঁক গুলি বার হয়ে গেল অনেকেরই। মুংলি ফিরে দেখল কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি। আর কোন কিছু—ভাবতে পারল না ও। সোজা এগিয়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে ধরল রেডিও যন্ত্রটাকে। স্পষ্ট অথচ কাঁপা গলায় বলল।—দাও এটা। একজনের বাঁচা মরা এর উপরে।—

বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই ছিল না গ্রাটেনকোর। কেমন যেন বোকার মতন ও দাঁড়িয়ে রইল। রেডিও যন্ত্রটা খুলে এনে টমের হাতে দিল মুংলি।

সবাই ঝুঁকে পড়ল ওটার উপরে। টম চাবি ঘুরিয়ে ওটাকে চালাতে যাবে যেই, হঠাৎ পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল তমুক্কা। রেডিও ছেড়ে সবাই চট করে উঠে দাঁড়াল। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল—যে গুরুদিৎকে নিয়েই এত গোলমাল, সেই টলতে টলতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মুংলি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। বাঃ এই তো ভাই তুমি বেশ হাঁটতে পারছ। তুমি ভাল হয়ে গেছ। হাঁপাতে হাঁপাতে গুরুদিৎ বলল—আমাকে নিয়েই যখন এত গোলমাল ডাক্তার দিদি তখন আর আমি শুয়ে যাব

না। আমি হেঁটেই যাব—

—পারলে নিশ্চয়ই যাবে। হেসে উত্তর দিল মুংলি।

টম রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে ডাকতে লাগল—হ্যালো হ্যালো ব্রাণ্টালুসি উদ্ধারকারীরা……

ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—তোমরা অতক্ষণ চুপ করে ছিলে কেন! ভাল আছ তো সবাই।

—হ্যাঁ ভাল আছি। জানো ত আমরা বন্দী……

ছুটে এলো গ্রাটেনকো। নিজেকে ও সামলে নিয়েছে। চেঁচিয়ে বলল -বল্ বল্ গ্রাটেনকো শুধু নিজের মুক্তি চায় আর তার বদলেই কেবল তোরা ছাড়া পাবি। নইলে এই গ্রাটেনকোর মতনই তোদেরও সারা জীবন এই জঙ্গলে ঘুরে মরতে হবে। এ জঙ্গলের ত্রিসীমায় কেউ ঢুকলে আমি তোদের খুন করবো। করে গাছের ডালে লটকে দেবো। আর বল আমার খাবার চাই। অনেক খাবার। রোজ রোজ। নইলে আমি তোদের উপোস করিয়ে রাখবো ও সব কথা বলে গ্রাটেনকো প্রাণখুলে হেসে উঠল।—বল বল। গ্রাটেনকো আর এখন বন্দী নয়। এ জঙ্গলে সেই রাজা। বন্দী এখন তোদের প্রেসিডেণ্ট। সে আমার মেয়েটাকে মিছিমিছি মেরেছে। তার বদলা নেব আমি।

টমকে আর এসব কথা বলতে হল না। রেডিও খোলাই ছিল। ওদিকে সব কথাই প্রেসিডেণ্ট নিজের কানে শুনতে পেলেন। শুনে শিউরে উঠলেন।

তবুও টম বলল—আমি আর কি বলব গ্রাটেনকো। তুমি নিজেই স্পষ্ট করে বল না কি চাও। এই নাও রেডিও।

ওর কথা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল গ্রাটেনকো। এক দু মিনিটেই সে ভাব কাটিয়ে বলল—বলবই তো। আমি কি আর কাউকে ভয় করি নাকি? দে রেডিও দে।

যন্ত্রের বোতাম টিপে টম সেটা দিল ওর হাতে। ওটা হাতে নিয়েই গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করল—সোজা কথা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমাকে এমন কুকুর বানিয়েছে কে? তাদের কেন সাজা হবে না? তাদের বেলায় মাফ্ আর আমার গলায় দড়ি? আমাতে ছেড়ে দিতে হবে। সে কথাই আমি শুনতে চাই। নইলে এদের আমি ছাড়বো না। কখনো ছাড়বো না।

বোতাম টিপে দিয়ে হেডফোন কানে দিল টম। কিছুক্ষণ ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর স্পষ্ট শোনা গেল—তোমার কথা শুনেছি গ্রাটেনকো। তোমার কথা ভেবে দেখা হবে।……

মুখস্থের মতন টম সে কথা শোনালো গ্রাটেনকোকে। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—ফাঁকা কথা। মিথ্যা কথা। ওসব আমি শুনতে চাই না। কি ভাববে ওরা আমার সম্বন্ধে! কে ভাববে? ঐ মাথা মোটা প্রেসিডেণ্ট! ওর মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। ওই তো জোর করে আমাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। আমি ছাড়বো না। কাউকে ছাড়বো না। ওরা মিথ্যা কথা বলে আমাকে আরও ফাঁসাতে চায়। অত বোকা গ্রাটেনকো নয়।

ওর চিৎকার থামার সাথে সাথেই ওদিক থেকে স্পষ্ট করে রেডিওতে বলল—গ্রাটেনকোকে প্রেসিডেণ্ট বলেছেন ওর কথা তখনই ভাবা হবে যখন সবাইকে ও ছেড়ে দেবে। আগে ওদের ছেড়ে দাও। প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে ওর হয়ে বলবেন। কবে কোথায় ওদের ছাড়বে জানাও। আমাদের হেলিকপ্টর যাবে সেখানে। ওর হুকুম মত প্রচুর খাবার ও অন্য জিনিসপত্র এখুনি ফেলা হবে।

কোথায় ফেলবে জানাও। ঠিক নিশানা দাও। নইলে জিনিস নাবাতে কষ্ট হবে। একথাগুলোও গ্রাটেনকোকে জানাল টম।

—ঘাস খায় লোকগুলো সব ঘাস খায়। ভেবেছে কি ওরা? যেখানে খুশি জিনিস ফেলুক! বলে লাফাতে লাগল গ্রাটেনকো।

—আমাকে কি অতই বোকা ভেবেছে? আগে ছেড়ে দেব সবাইকে তারপর গিয়ে সোজা ঝুলবো দড়িতে! ঐ মাথা মোটা প্রেসিডেন্ট আর তার মন্ত্রীগুলো এর বেশী আর কি ভাববে আমার সম্বন্ধে। সোজা বলছি—স্পষ্ট কথা শুনতে চাই আমার সম্বন্ধে! হেঁয়ালী বুঝিনা। নইলে বাছাধনরা পচে মরুক আমার সঙ্গে। বলেছে বাজে কথা বকার সময় আমার এখন নেই। রাতে কথা হবে। আবার ততক্ষণ ঐ মোটা বুদ্ধির লোকগুলো ভাবুক কি করবে ওরা।

টম, রেডিওর বোতাম টিপে এই কথা গুলোই গুছিয়ে ওদের বলল। আরও বলল—গুরুদিৎ এখন ভাল আছে। ও হাঁটতে পারছে। ওদিক থেকে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ওরা। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো—বন্ধ কর ওটা এখুনি। নইলে ওটাকে আমি গুঁড়িয়ে দেব।

ভয়ে ভয়ে রেডিওটা বন্ধ করল টম।

মুংলি বলল। আমার যে ডাক্তারের সাথে কথা বলার ছিল।

—তোর রুগীতো ভাল হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে। বাকি যত বাজে কথা তোর রাতে বলবি। এখন হাঁটতে সুরু কর আবার।

ধাক্কা দিয়ে সবাইকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগল গ্রাটেনকো।

—চল চল! চল বলছি!!

ওর ধাক্কা খেয়েও কেউ কিন্তু নড়ল না। তা দেখে আরও ক্ষেপে গেল গ্রাটেনকো। চেঁচিয়ে উঠল।—চল বলছি নইলে…

রাণা বলাতেই আবার সবাই হাঁটতে সুরু করল। গুরুদিৎ কারও কথা শুনল না। জোর করে হেঁটেই চলল। মুংলিও ওর পাশে পাশে চলল। যদিও ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল তবুও গুরুদিৎ সবার কষ্টের কথা ভেবে জোর করেই হেঁটে চলল। বলল—কিছু ভেব না ডাক্তার দিদি। আমি পারব।

—এ আমরা কোথায় চলেছি? চুপিচুপি হামিদুল জিজ্ঞাসা করল।

—মনে হচ্ছে গাছপালা যেন ক্রমে কমে আসছে! বলল বিলি।

—পথ কেমন নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে দেখ। বলল রাজা।

—হ্যাঁ তাইতো দেখছি। মাটির চেহারাও বদলাচ্ছে। বলল রাণা।

—আসে পাশে জল কোথাও নেই মনে হচ্ছে। বলল টম।

ক্রমে ঝোপ, ঝাড়, গাছপালা একেবারেই কমে গেল। মাটির উপরে ছড়ানো নুড়ি পাথরে জায়গাটা ভরা। এসে ঢুকল বৃষ্টি ধোওয়া ভাঙ্গাচোরা এবড়ো খেবড়ো খদের ভিতরে। সে খদও গোলক ধাঁধার মতন। চারদিকে ছড়ান। যত এগোও ততই ওর মুখ নানান দিকে বার হয়ে গেছে। কি যেন কি চিহ্ন দেখে গ্রাটেনকো সেই চালু খদের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে নেবে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে গভীর হল সে খদ। শেষে এক সময়ে ওরা এসে পড়ল এমন একটা জায়গায়—যেখান থেকে আর উপরের পৃথিবী দেখা যায় না। চারপাশ ঘিরে সুধুই খদ আর খদ। রুক্ষ কাঁকুড়ে জমি। কোথাও এতটুকু ঘাস বাঁশঝাড় নেই শুধু ছোট ছোট কাঁটা গাছে

ভরা চারদিক। জলেরও কোন চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রাণার। এ ভীষণ গোলকধাঁধা থেকে পথ খুঁজে বার করা অসম্ভব। গ্রাটেনকোকে ফাঁকি দিয়ে পালানো আর যাবে না আর তার জন্যই এর মধ্যে ওদের এনেছে গ্রাটেনকো। কারও মুখে কোন কথা নেই। স্ট্রেচার টানার ফলে সবাই হাঁপাচ্ছে। সবাই যেন কেমন থমকে গেছে।

আস্তে আস্তে দিনের আলোও ফুরিয়ে এলো।

খদের ভিতরে অন্ধকার জমতে শুরু করে দিয়েছে। একটুতেই সে অন্ধকার হঠাৎ যেন জমাট বেঁধে গেল। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পায়ে পায়ে সবাই হেঁটে যাচ্ছে। তবুও থামার কোন লক্ষণ নেই গ্রাটেনকোর। বাচ্চাদের মধ্যে হঠাৎ কে যেন কাঁদতে সুরু করল। তখন আর থাকতে না পেরে রাণা চেঁচিয়ে উঠল—থামো সবাই। থামো।

এই হুকুমের জন্যই যেন সকলে কান পেতে ছিল। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। যে কাঁদছিল তার কান্নাও বন্ধ হল। স্ট্রেচার নাবিয়ে সকলে হাঁপাতে লাগল। রাণা ভেবেছিল গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করবে কিন্তু অবাক হল—যখন দেখল ও একটা বড় পাথরের ঢিপির উপরে বসে পড়ে মনের সুখে শিষ দিতে সুরু করল। সে শিষের শব্দ সবার কানে পৌঁছাতেই অত ক্লান্তির মধ্যেও সকলে অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ ফেরালো। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। বোঝা গেল না কেন হঠাৎ এমন খুশি হয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

অন্ধকারের মধ্যেই মুংলি বলল—জল চাই আমাদের।

—আমরা সবাই জল খাব।

কথাটা ও বলেছে গ্রাটেনকোকেই। কিন্তু মনে হল না সে কথা ওর কানে গেছে। ও যেমন শিষ দিচ্ছিল তেমনি দিতে থাকল।

শুনতে পাচ্ছ? রাগ করে চেঁচিয়ে উঠল মুংলি। থামল শিষ। লাফিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। ধুপ ধাপ করে মুংলির সামনে ওগিয়ে এসে বলল—অত রাগ কেন তোর? জল খাবি তো খা যত পারিস।

—ঠাট্টা করছ? থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল মুংলি।

—কে বলল? দু পা এগোলেই তো জল। এগো না। এগো।

রাণা বলল—এ আমরা এসেছি কোথায়?

—এমন জায়গায় যেখান থেকে পালাতে গেলে পথ হারিয়ে জল তেষ্টায় মরতে হবে সবাইকে। কেউ পালাতে পারবে না এখান থেকে। আর কেউ তোদের খুঁজেও পাবে না।

ওর কথা শুনে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল রাণার। একটু চুপ করে থেকে বলল—বেশ, এখন কোথায় জল বল। আমাদের সবার তেষ্টা পেয়েছে।

—বেশ দাঁড়া দু মিনিট।— বলল গ্রাটেনকো।

—আমি আসছি এখুনি। যত পারিস জল খাস তখন।

অন্ধকারে খদের একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। ওর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই রাজা বলল--ও চলে গেছে। আমরা একলা।

টম বলল—পালাবে?

বিলি বলল—নিশ্চয়ই। ও ফেরার আগেই।

—না—। ধমকে উঠল রাণা। ওসব বাজে কথা ভেবো না এখন। এ ভীষণ খদের মধ্যে থেকে পথ

না জানলে বার হওয়া অসম্ভব। সঙ্গের বাচ্চাদের কথাও তো ভাববে। জল ছাড়া ওরা চলতে পারবে কেন?

সবাই একথা শুনে চুপ করল। সবারই মন খারাপ হয়ে গেল।

—মন খারাপ কর না। বলল রাণা।—দেখো নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। বুদ্ধি করে এক সাথে আমরা যদি চলতে পারি।—

তমুক্কা হঠাৎ বলল—গ্রাটেনকোকে যত খারাপ ভাব ও কিন্তু তত খারাপ নয়। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ওকে ভাল করতে পারব। এস আমরা তাই করি। ও ছাড়া এ জঙ্গলে থেকে কেউ আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

বিলি বলল—কিন্তু, মাঝে মাঝে ও যা ক্ষেপে যায়!

টম বলল—কিন্তু তবুও কোথায় যেন ওর কিছু ভাল আছে। দেখলে না তখন ও স্টেনগানটা এমন করে চালালো যে কেউ যেন এতটুকু ব্যথা না পায়।

বিলি বলল—বলেছে তো আমাদের মেরে ফেলা ওর উদ্দেশ্য নয়।

রাণা বলল—কথা তুমি মন্দ বলনি তমুক্কা দি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কেন পারবো না? ওকে ভালো করতে না পারলে আমরাই বা কেমন মানুষ!

মুংলি বলল—নিশ্চয়ই। ও যত রাগীই হোক না কেন—মানুষ তো। আর মানুষ কত খারাপই বা হতে পারে?

রাজা বলল—চুপ কর সবাই, আমি যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

হামিদুল বলল—আমিও তোমাদের দলে ক্যাপ্টেন। ওকে ভাল করতেই হবে। নইলে আমরা কিছুতে এখান থেকে যেতে পারব না।

রাজা বলল—চুপ কর সবাই—ঐ দেখ।

সবাই তাকিয়ে দেখল—দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাচ্চারা সবাই আনন্দে এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল—আলো আলো। ওরা আসতেই তমুক্কা চাপা গলায় বলল—মনে থাকে যেন আমাদের কথা। সবাই একসাথে উত্তর দিল—নিশ্চয়ই। একটা বিরাট মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরল গ্রাটেনকো। মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ অদ্ভুত সব আওয়াজ করে আপন মনে হেসে শেষে চেঁচিয়ে উঠল—ও পালাসনি তোরা খুঁদে শয়তানের দল। পালাসনি কেন? যাক্ বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।

—জল কোথায়? জিজ্ঞাসা করল।

—আমার পকেটে। হেসে উত্তর দিল। তারপর বলল।—আয় আমার সাথে। আয়। আয়। সবাই। আমরা পৌঁছে গেছি আমার গোপন গুহায়। ব্যস সেখানেই তোরা থাকবি। তারপর দেখব কে তোদের খুঁজে বার করতে পারে।

—এসো সবাই। রাণা ডাকল।

ওর ডাক শুনে ভীষণ অনিচ্ছাতে সবাই উঠে দাড়াল। আবার হাঁটতে হবে। সে কথা ভেবেই সবার মন খারাপ হল। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলনা। গোটা দুই তিন বাঁক এদিক ওদিক ফিরে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়াল গ্রাটেনকো। ওর হাতের মশালটা একটু উঁচুতে তুলে ধরতেই সবাই দেখল—সামনেই এক পাশে—একটু দূরে খদের দেওয়াল ফুঁড়ে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। সবার বুকই যেন কি এক ভয়ে

কেঁপে উঠল। ওই তাহলে সেই ভয়ঙ্কর গুহার মুখ!।৮ঐ ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেই তাহলে ওদের বন্দী থাকতে হবে।

—দাঁড়ালি কেন তোরা? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। চল চল। তোদের পৌঁছে দিয়েই আমাকে আবার ফিরতে হবে ঐ ভাঙ্গা প্লেনে। জিনিসপত্রগুলো আনতে হবে। নয়ত কাল হয়ত ভীষণ দেরী হয়ে যাবে। কে বলতে পারে ওরা হয়ত ঢুকবে জঙ্গলে তোদের খোঁজে।

কেউই এসব কথার কোন জবাব দিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সবাই সামনের দিকে। তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দীই হতে হবে ওদের!

কেন এমন বোকার মতন চলে এলো ওরা? না এলে কি করত গ্রাটেনকো?—মেরে ফেলতো ওদের!

গুহার মুখে হাতের মশালটাকে মাটিকে গুঁজে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গ্রাটেনকো। ওর পিছনেই এগোলো রাণা। অল্প অল্প আলো এসে পড়ছে ভিতরে। তাতে ভিতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা গেল না। একটু ঢুকেই থামল রাণা।

দাঁড়া তোরা। চেঁচালো গ্রাটেনকো। আরও একটা মশাল জ্বালছি আমি। তবেই সব দিকে আলো হয়ে যাবে। সব কিছুই আছে এ গুহায়। জল-আলো। আর কিছু চাস না যেন। খুব সুখেই থাকবি তোরা এখানে।

বলতে বলতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রাটেনকো। তার কিছু পরেই একটা মশাল ধরিয়ে ফিরল। সেটাকে পুঁতে দিল গুহার ঠিক মাঝখানে। এক নজরে চারদিক দেখে নিল রাণা। না যতটা খারাপ ভাবা গেছিল ঠিক ততটা নয়। বেশ বড় এ গুহায় সবার জায়গা ভাল ভাবেই হয়ে যাবে। তাছাড়া তিন দিক বন্ধ থাকার জন্য হঠাৎ অন্য কোন বিপদের কিছু ভয় নেই।

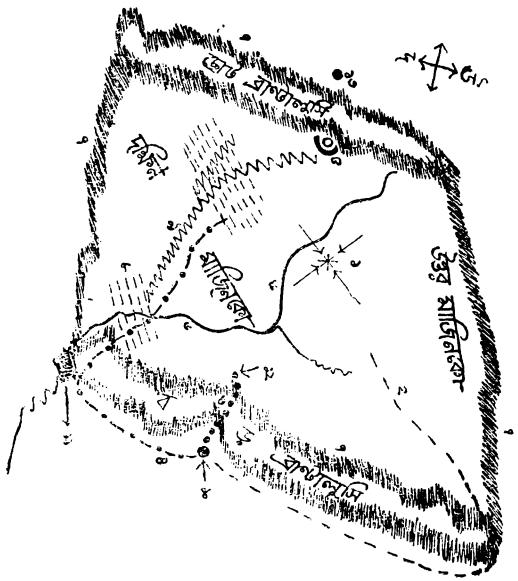

১। প্লেনের ধ্বংসাবশেষ
২। কিকুর যাত্রাপথ
৩। মিডির যাত্রাপথ
৪। হকের যাত্রাপথ
৫। গ্রাটেনকোর গুহা
৬। টিবল্লি নদী
৭। মালভূমি শেষ
৮। ভূমিকম্পে ফাটা চৌচির জমি
৯। টিবল্লি নদীর মরা খদ
১০। তির্নিকা গ্রাম
১১। ব্রাকা জলপ্রপাত
১২। চকমির তাক
১৩। টোপকির শেষ পুলিশ চৌকি

সব থেকে ভাল এই যে এক কোণের দেওয়ালের ফাটল বেয়ে সরু একটা জলের ধারা নেবেছে। তার তলায় বড় একটা গর্ত করে সে জল ধরে রেখেছে গ্রাটেনকো।—পরিষ্কার আর মিষ্টি সে জল।—

—সবাই এসো ভিতরে।—গুহার মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল রাণা।—এসো, কোন ভয় নেই এখানে। জায়গাটা ভালই।

ক্লান্তিতে সবারই শরীর ভেঙে পড়ছে। তার উপরে একটা ভীষণ ভয় আর উত্তেজনায় কেটেছে সারা বিকালটা। এখন হঠাৎ ক্যাপ্টেনের মুখে জায়গাটা ভাল শুনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মুংলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল—আগে আহতদের ভিতরে নেওয়া হোক্। তারপরে বাচ্চাদের।

এক এক করে সবাই ওরা ভিতরে এসে ঢুকল। এক পাশ ঘেঁসে স্ট্রেচার নাবাল ওরা। তারপর সবাই বসে পড়ল পাথরের মেঝের উপরে। ছোটরা গেল জলের কাছে। সেখানে গিয়ে সবাই আঁজলা ভরে জল খেতে লাগল।

ওদের সবাইকে বসতে দেখে—খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—আমার কাজ সারা। এখান থেকে কাউকেই আর পালাতে হবে না। আর কেই বা খুঁজে বার করবে এ জায়গাটা?—ব্যস। এবারে আগে আমার একটা গতি হোক তারপর তোরা ছাড়া পাবি।—এখন আমি নিশ্চিন্ত।—

রাণা ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলল—আচ্ছা। সুধু জল খেয়ে কি মানুষ বাঁচে? এখানে আমরা খাব কি?—ঐ বাচ্চারা কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারবে?

—তার আমি জানি কি—দাঁত মুখ ভেংচে বলল গ্রাটেনকো।—আমি তো জানিয়েই দিয়েছি অনেক খাবার পাঠাতে। না পাঠালে এখানে কোথায় তোদের জন্য রাজভোগ যোগাড় করব শুনি!

—তবে কি আমরা না খেয়ে মরবো?

—ইঃ কথা শোন বাবুর। কে বলেছে না খেয়ে মরতে। মারতে হলে তো আমার হাতে বন্দুক আছে। আমি তো তোদের মারবো বলে এখানে আনি নি।

—তবে খাবারের ব্যবস্থা কর। গম্ভীর ভাবে রাণা বলল।—বন্দুক যখন আছে কিছু শিকার করে নিয়ে এসো। আগুনে পুড়িয়ে খাব আমরা।

—হুকুম করছিস আমাকে? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

টম বলল।—আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না। রেডিওতে খবর দিলে ওরা হয়ত কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।—আর বিছানাপত্র ওষুধও তো আমাদের চাই আরও।—রেডিও চালাবো?

—তবে এতক্ষণ চুপ করে বসে আছিস কেন? বলল গ্রাটেনকো—বল ওদের সব জিনিস পাঠাতে এক্ষুনি।—

রেডিওর চাবি সঙ্গে সঙ্গে টিপে টম ডাকতে আরম্ভ করল।—হ্যালো হ্যালো…।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আকাশে প্লেনের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাটেনকো ছুটে বাইরে বার হয়ে গেল।—মিনিট কুড়ি বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো পিঠে বিরাট দুটো বোঝা বয়ে। সে দুটো নাবিয়ে দিয়েই আবারো ও বার হয়ে গেল।—ফিরল তেমনি বোঝা বয়ে। সে বোঝা নাবিয়ে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ও হাঁপাতে লাগল।

রুক্মিণী শকুন্তলা শান্তা ততক্ষণে বোঝাগুলো খুলতে সুরু করে দিয়েছে। খাবার। ওষুধপত্র, বিছানা—পোষাক। দরকারি যা সবই পাঠিয়েছে ওরা। এক এক করে সব কিছুই ওরা গুছিয়ে রাখল।

টম রেডিওর চাবি আবার টিপে বলল—হ্যালো। সব কিছুই আমরা পেয়েছি।—ধন্যবাদ।

ওদিক থেকে বলল—আমরা গ্রাটেনকোর সাথে কথা বলতে চাই।—এখুনি।—

গ্রাটেনকো খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল—বেশ বেশ—বলুক কি বলতে চায় ওরা। শুনবো ওদের কথা।—

ওদিক থেকে বলল—প্রেসিডেন্ট তোমার কথা ভেবে দেখছেন। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। তোমার নামে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে তা তুলে নেওয়া হবে।—তবে তার আগে তোমাকে প্রেসিডেন্টের একটা কথা মেনে নিতে হবে। তা হল—তুমি আগে বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেবে। কোথায় এবং কখন তুমি ওদের মুক্তি দেবে জানাও। লোক যাবে ওদের নিয়ে আসতে। তাতে রাজী না হলে তুমিই ওদের পথ দেখিয়ে পৌঁছে দাও।—এর পরই তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।—

আবারও এসব কথা! গ্রাটেনকো যেন ক্ষেপে গেল। ভীষণ ভাবে চেঁচাতে সুরু করল—সেই পুরনো কথা? আগে সবাইকে ছেড়ে দেব? কতবার তো বলেছি ও সব হবে না। তবুও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের ঐ এক কথা। আমি ওদের কথার ফাঁদে পড়ব না।— সারারাত ভেবে দেখুক মাথামোটা লোকগুলো। আরও সহজ কিছু ভাবতে পারে কিনা। কাল ভোরে আমি ওদের শেষ কথা শুনতে চাই। তারপর যা করার আমি করব।

ধমকে গ্রাটেনকো টমকে বলল—বন্ধ কর তোর ঐ কথার যন্ত্রটাকে।—দে ওটা আমাকে। ওরা বুঝুক গ্রাটেনকো অত সহজ লোক নয় যে ওদের কথায় নাচবে।—

সত্যি রেডিও যন্ত্রটা টমের কাছ থেকে কেড়ে নিল গ্রাটেনকো। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। গুহার ভিতরের মশালটাও নিবু নিবু। বাইরের মশালটা আগেই নিভেছে।—শুয়ে পড় সকলে।—শুয়ে পড়।—নইলে সবাইকে আমি এক এক ঘুঁষি মেরে শুইয়ে দেব।

সারাদিন পথ চলার ক্লান্তিতে সকলের চোখে এমনিতেই ঘুম এসে গেছিল। বাচ্চারা অনেকেই ঢুলতে সুরু করে দিয়েছে।

ধমক শুনে রুক্মিণী শান্তা আর শকুন্তলা উঠে কম্বলগুলো বিছাতে সুরু করে দিল। ওকে সাহায্য করতে এগোলো হামিদুল আর কুণাল।—এক এক করে সবাই শুয়ে পড়ল। শেষ বারের মতন তমুক্কা আর আমিনাকে দেখল মুংলি। ওদের কোন কিছুর দরকার আছে কিনা। ওরও তখন ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।—ওদের এক পাশেই ও ওর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল—রাত্রিবেলা দরকার পড়লেই আমাকে ডেকো কিন্তু আমিনা।—

বিলি টম রাণা আর হামিদুল পাশাপাশি শুল। চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে যেই দুচারটে কথা বলেছে ওরা অমনি গর্জন করে উঠল গ্রাটেনকো।—চুপ করলি তোরা? নইলে তোদের মাথা গুঁড়ো করে দেব।

ওর ও কথায় কিন্তু ওরা কেউই ভয় পেল না। কিন্তু বুঝল গ্রাটেনকোর সামনে কোন কিছুই আলোচনা করা যাবে না।

অগত্যা ওরাও ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগল।—চোখ যখন জড়িয়ে এসেছে শুনতে পেল আপন মনে বিড়বিড় করছে গ্রাটেনকো।—না ছাড়বে তো না ছাড়ুক আমাকে। এই বেশ ভাল হল। এখন বেশ কিছু দিন আরাম করে সরকারি খানা খেয়ে সুখে কাটাব।—আমার তো ভালই হল।—যা চাইবো তাই পাব। তাই দিতে হবে ওদের।—

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তমুক্কা খেয়াল নেই ওর। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছে তাও জানে না। রাত এখন কটা? হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল ওর। না পায়ে কোন ব্যথা নেই। মুংলী যে শক্ত করে

বেঁধে দিয়েছে তার জন্য কেমন যেন খারাপ লাগছে সুধু। মেয়েটা না থাকলে কি হত ওর? সুধু ঐ মেয়েটাই বা কেন—আর অন্য সকলে! না—ওরা অসম্ভব কে সম্ভব করেছে।—গ্রাটেনকো তো বোধ হয় ওকে মেরেই ফেলতো। সুধু ওরা সবাই রুখে দাঁড়ালো বলে আজ তা হয় নি। কি সুন্দর এই ছেলেমেয়ে গুলো। ভগবান ওদের তুমি রক্ষা কর এই শয়তানটার হাত থেকে। কেমন যেন হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হল ওর।—পরক্ষণেই মনে হল সুধু ও কি নিজেই অসহায়—এই সব ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলোও কি অসহায় নয়?—কোথায় এসেছিল ছুটিতে বিদেশে আনন্দ করতে। আর তার বদলে আজ তারা বন্দী। প্রতি মুহূর্ত একটা শয়তানের সাথে বুদ্ধির লড়াই করে চলতে হচ্ছে ওদের। একটু ভুলে কি ভীষণ কাণ্ডই না ঘটে যেতে পারে।

রাগ হল ওর দেশের লোকদের ওপরে। তারাই বা কেমন এমন বিপদের দিনে এগিয়ে আসছে না তাড়াতাড়ি একটা লোকের ভয়ে সবাইকেই কি চুপ করে ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করে বসে থাকতে হবে।

সারা গুহায় ঘুরঘুটে অন্ধকার। শুধু গুহার মুখের কাছে একটু যেন আলোর সাড়া। সেখানেই শুয়ে আছে শয়তানটা। শিশুদের ভারি নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাঃ আর ঘুম আসবে না তনুক্কার। এখন শুধু জেগে থেকে দুশ্চিন্তা করা। আজ যদি পা দুটো ভাল থাকতো ওর তবে একবার দেখে নিত কত বড় শয়তান ঐ গ্রাটেনকো! কিন্তু সে আর হবার নয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস গুহার মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে সারা শরীর কাঁপিয়ে দিল ওর। অনেক কষ্ট করে পায়ের কাছের কম্বলটা টেনে নিজেকে ঢাকা দিল তনুক্কা। আচ্ছা ছেলেমেয়েদের এ বাতাসে ঠাণ্ডা লাগবে না তো? ওদেরও ভাল করে ঢাকা দিয়ে দেওয়া উচিত। ভাবল ডাকবে মুংলিকে। ও ছাড়া এ কাজ করবে কে? ডাকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল গুহার মুখের কাছে যেন কিসের ছায়া। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ওর। কোন জন্তু নয় তো? হ্যাঁ ছায়াটা নড়ছে। ভয়ে গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল ওর। বাপ্‌রে! এ ছায়া যে ঢুকছে ভিতরে। শয়তানটাও কি জেগে নেই নাকি। চেঁচিয়ে উঠতে যাবে তনুক্কা। তখুনি বুঝতে পারল—না ভুল করেছে ও। ও ছায়া কোন জন্তুর নয়। ও ছায়া গ্রাটেনকোর। কি মতলব লোকটার? এত রাতে অমন নিঃশব্দে ও ঢুকছে কেন ভিতরে? ক্যাপ্টেনকে ডাকবে নাকি? কি সর্বনাশ করতে চায় ও রাতের অন্ধকারে? হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল গ্রাটেনকো। কি যেন বললও ও বিড়বিড় করে। তার কোন কথাই কানে গেল না তনুক্কার। দেখল—একটা কম্বল তুলে নিয়ে কাকে যেন ঢাকা দিয়ে দিল গ্রাটেনকো। পাশের কাকে যেন ঠিক করে শুইয়ে দিল।

তারপর সারা গুহাময় ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখে বেড়াল গ্রাটেনকো। ওর দিকেও যখন আসতে লাগল তখন চোখ বুজে দম বন্ধ করে পড়ে রইল তনুক্কা। স্পষ্ট বুঝতে পারলো পাশে এসে দাঁড়াল গ্রাটেনকো দু সেকেণ্ড। বিড়বিড় করে বলল—বাঃ বাঃ এ আমার বেশ ভালই হল। ডাকাত গ্রাটেনকো আজ কিনা রাত জেগে—খুদে শয়তানদের পাহারা দিচ্ছে।—কার ঠাণ্ডা লাগবে দেখে বেড়াচ্ছে! জঙ্গলেও ঘরবাড়ি পেতে বসেছে। নিজের ঘরই সইল না যার সে কিনা পরের ঘর সামলাচ্ছে। বাঃ বাঃ!

বিড় বিড় করতে করতে গ্রাটেনকো চলে গেল। ওর পায়ের আওয়াজ সরে যেতেই চোখ মেলল তনুক্কা—ভীষণ অবাক হয়ে গেছে তনুক্কা। এ কেমন হল? এই তো কিছুক্ষণ আগেই লোকটাকে ও শয়তান ভাবছিল। এই রাতের অন্ধকারে ও যা করল তা তো কোন শয়তানের কাজ নয়। সে তো যে কোন সাধারণ মানুষের কাজ। না না—লোকটা আর যাই হোক—শয়তান নয়। এমনও তো হতে পারে—ওর সাথে কেউ কোন দিনও ভাল ব্যবহার করেনি? ওকে কেউ ভালবাসে না? এমন কি কেউ ওর কথাও ভাবে না। যখনই ওর নাম মনে করে তখনই ঘেন্নায় মুখ ভেংচায়। হয়তো তার জন্যই লোকটা আজ এমন হয়ে গেছে।

তাকিয়ে দেখল তমুক্কা—লোকটা আবার নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে দাঁড়াল গুহার মুখের কাছে। দু চার সেকেণ্ড। তারপর বসে পড়ল দেওয়ালে হেলান দিয়ে। কি হয়েছে লোকটার আজ! এত রাতেও ও ঘুমাচ্ছে না কেন! কেন অমন করে বসে পড়ল একপাশে! কারও কথা কি আজ হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে! এমন কেউ যাকে ও ভালবাসতো! যার জন্য এমন করে রাত্রে ও জেগে বসে থাকতো। কে সে? কোথায় সে আজ? আহা ওর ও হয়ত বাড়ি ঘর আছে। আছে আপন জন। সবার তাড়া খেয়ে এ জঙ্গলে আজ ও লুকিয়ে আছে ভয়ে। বাড়ির কথা কি ও ভুলতে পেরেছে তাতে? না না লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছে ও আজ আসলে ও তত খারাপ নয়। লোকটার মনের কোথাও নিশ্চই একটা ভীষণ ব্যথা লুকানো আছে। সে ব্যথা ও পেয়েছে—মানুষের কাছ থেকে। সব মানুষকেই তাই ও আজ এমন করে ভয় করে। আর বোধ হয় প্রাণপণে চেষ্টা করে ঘেন্না করতে। তমুক্কা দেখতে পেল—কেমন করে যেন ঘুমন্ত শিশুদের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাটেনকো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও তেমনি করে। তারপর ওর বুক চিরে বার হয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

আস্তে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গ্রাটেনকো। ওর আর কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। মনে মনে ভীষণ নিঃশ্চিন্ত হল তমুক্কা। এ লোকটাকে এখন ও ঠিক সামলে নিতে পারবে। আর ওর চিৎকার চেঁচামেচিকে এতটুকুও ভয় করবে না তমুক্কা।—ও তো পশু নয়। ও তো মানুষ। একটা সাধারণ রাগী মানুষ যে কারও কাছে কোন দিন ভাল ব্যবহার পায় নি। এতটুকু ভাল ব্যবহার পেলেই যে খুশি হতে পারতো—

হঠাৎ শুনতে পেল—বাইরের দিক থেকে গ্রাটেনকোর প্রচণ্ড নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। লোকটাও তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছে। খুশি মনে নিজেও ঘুমাবার চেষ্টা করল তমুক্কা। তখুনি পাশে যেন কেমন একটু শব্দ হল—চাপা গলায় মুংলি জিজ্ঞাসা করল—

—জেগে আছ তমুক্কা দি?

—হ্যাঁ বোন।

—কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—না।

—সব দেখেছো তুমি?

—হ্যাঁ। আমরা ওকে মিছিমিছি ভয় করি বোন। ও মোটেই খারাপ নয়। যা কিছু করে ও ভয়ে—আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

—আমার ও তাই মনে হয় দিদি। ও কিন্তু খুব দুঃখী। না?

—হ্যাঁ।—

তারপর চুপ করল ওরা। আকাশ পাতাল নানান চিন্তা করতে করতে কখন যে ওরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে তা আর ওদের খেয়াল নেই।

সকাল বেলাই চেষ্টা করেছে হোলখ্। কিন্তু গ্রাটেনকোর শেষ চিৎকারের পরে সেই যে রেডিও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তারপর ওদিকের আর কোন সাড়া নেই। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় সময় কেটেছে সবার। অবশ্য এও হতে পারে এত ভোরে হয়ত ওরা কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। কিন্তু গ্রাটেনকো তো বলেছে আজ সকালেই ও শুনতে চায় শেষ কথা। গ্রাটেনকোর নিজেরও তো কৌতূহল থাকতে পারে। অনেক রাত পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট মিটিং করেছে মন্ত্রিমণ্ডলীর সাথে।—এখন কি করা উচিত সে সম্বন্ধে। সবাই এক মত গ্রাটেনকোকে এতটুকুও বিশ্বাস করা চলবে না। অথচ কেউই বলতে পারে নি কি করলে বন্দীদের মুক্ত করা যেতে পারে।

রাত বারটায় মিডি হকো আর কিকুর সাথে রেডিও যোগাযোগ করেও কোন খবর পাওয়া যায় নি।—মিডি সারাদিন চক্‌মির তাকে বসে সমস্ত জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন মানুষের সাড়া পায় নি। অতগুলো মানুষ যেন একেবারে উবে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে।—

অবশ্য হকো আর কিকুও এগিয়েছে অনেক খানিকটা কিন্তু ওরাও ওদের পথেও কোন মানুষের সাড়া পায়নি। কি করা উচিত এখন এ প্রশ্নটাই সবার মনে। কিন্তু কেউই সঠিক কিছু বলতে পারছেনা।

গরম কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে আরডন ঘরে ঢুকলেন। পেয়ালাটা হোলখ্‌ এর দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

—না কোন সাড়া নেই ওদিকের। বলল হোলখ্‌।

—কঠিন সমস্যা। বললেন আরডন।—সব থেকে গোলমাল কোথায় জানেন? গ্রাটেনকোও জানে না সে এখন ঠিক কি চায়। কি সর্ত দিলে সে তা মানতে পারে।

—তাহলে উপায়? প্রশ্ন করল হোলখ্‌

—আমার তো মনে হয় এখন সব ব্যাপারটাই জেনারেলের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বুদ্ধি আর গায়ের জোর দুটোই এখন খাটাতে হবে। নইলে অমন শয়তানকে বাগে আনা যাবে না।

—কিন্তু তাতে কি ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হবেনা? গ্রাটেনকো তো যা খুশি তাই করে বসতে পারে।

—পারে। চিন্তিত ভাবে বললেন আরডন!—কিন্তু এওতো ভাবতে হবে সারা বিশ্বের কাছে কি কৈফিয়ত দেব আমরা। অতগুলো শিশু আর আহতের ভাগ্য নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলছি একটা শয়তানের ভয়ে? আমাদের এত বড় সৈন্য বাহিনী চুপ করে বসে তাই দেখছে!

—সে কথাও ঠিক। হতাশ ভাবে বলল হোলখ তখুনি ঘরে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট আর জেনারেল। ওঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কি ভীষণ চিন্তায় সময় কাটছে ওঁদের!

—কোন খবর আছে? জানতে চাইলেন জেনারেল।

—না কোন সাড়া নেই ওদিকের।

—আরও ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করতে হবে। যদি সাড়া পাওয়া যায় তো গ্রাটেনকোকে বলতে হবে ওকে শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ভেবে দেখার জন্য। ও রাজী হলে এখুনি ওর নামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোক নাববে জঙ্গলে বন্দীদের সব ভার নেবার জন্য। ওকেও ধরা দিতে হবে। সবাইকে সুস্থ সবল পেলেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।—এ কথাগুলো বললেন জেনারেল!

—বেশ আমি আবার চেষ্টা করছি। বলল হোলখ্‌।

ঘণ্টা খানেক ধরে সমানে ও রেডিওর সামনে বসে চেঁচালে। কোথাও থেকে কেউ ওর ডাকের সাড়া দিল না। হতাশ হয়ে ও হেডফোন নাবিয়ে রেখে তাকালো জেনারেলের দিকে।

—নাঃ অসম্ভব। গ্রাটেনকো আমাদের ডাক শুনতে চায় না।

—তার মানে আমাদের সামনে তাহলে একটা মাত্র পথই খোলা।—গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। —যা কিছু করতে হবে তা করতে হবে শক্তি দিয়ে।

—হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট। বললেন জেনারেল।—আর দেরী নয়। আমার সৈন্যদল তৈরী। আজই রাতের অন্ধকারে তারা দলে দলে নামবে জঙ্গলের নানান জায়গায়। গুলির মুখেই তারা মুক্ত করে আনবে আমাদের

অতিথিদের এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

—বেশ তবে তাই করা হোক, বললেন প্রেসিডেন্ট।—আমার মন্ত্রিমণ্ডলিকে আমি তাহলে একথাই জানাব।

হোলখ্ বলল—যা কিছু করা হবে সে তো রাত্রে। আমি তাহলে সারাদিন কিন্তু ওদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাব।

—নিশ্চয়ই। বললেন জেনারেল।—তোমার চেষ্টা তুমি ছেড় না।

—আচ্ছা যদি ফের যোগাযোগ করা যায় তবে কি আমদের কাজের ধারা আমরা পালটাব? জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—পালটাবো—যদি গ্রাটেনকো আমাদের সর্তে রাজী হয়। নইলে এখন থেকে আমাদের চেষ্টা হবে রেডিও মারফৎ ওকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে রাখা। যাতে নির্বিঘ্নে আমাদের সৈন্যদর নাবতে পারে।—জেনারেল বললেন।

—আমাদের এ মতলবের কথা কি আমাদের বন্দীদের জানাবো। জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—জানাবেন! কেমন করে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জেনারেল।—যা বলা হবে রেডিওতে তা যদি গ্রাটেনকোই শোনে তবে? আমার মনে হয় রেডিওটা ও নিজের কাছেই রেখেছে। আগে সব কথা নিজে শুনছে পরে ওদের দিচ্ছে। তাহলে?

একটু ভেবে আরডন বললেন—যদি আমরা সংকেতে খবর দিই?

সংকেত? ভাবলেন জেনারেল!—কিন্তু সে সংকেতের মানে কি ওরা বুঝতে পারবে?

—আমার তো মনে হয় পারবে। যদি সহজ সংকেত পাঠানো হয়।

—বেশ তাহলে তাই করবেন। যদি ফল পাওয়া যায়তো তাতে লাভই হবে।

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে জেনারেল বার হয়ে গেলেন। আরডন একটা কাগজ টেনে নিয়ে তখুনি বসে পড়লেন সংকেত বাক্য বানাতে।

হোলখ উঠে গিয়ে আবার বসলো ওর রেডিও যন্ত্রের সামনে—সুরু হল ওর ডাকা—হ্যালো হ্যালো ব্রাটালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি।...

কাগজের উপরে অনেকক্ষণ নানান হিজিবিজি কেটে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালেন আরডন। দুপা এগিয়ে গিয়ে কাগজটা রাখলেন হোলখের সামনে। ডাক বন্ধ করে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়ল হোলখ। অবাক হয়ে দেখল তাতে লেখা আছে :—

"তোমাদের কজনকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম দাঁড়ি সে কথাটাই পড়বে কমা সুরু কিন্তু শেষ দাঁড়ি আমরা রাতেতে ফানুসটা মজা করে গগনে হঠাৎ বেঁধেছি দাঁড়ি লোহার কপাট খুলে রোজ মা কাছে ডাকে দাঁড়ি জলে লঙ্গর খুলে পড়ে গোবিন্দ পদর নয়শ সাতাশ বস্তার ধান ঘুণ দাঁড়ি দাঁড়ি কমার মানে নেই দুটো অক্ষরই বাজে।"

মাথা নেড়ে হোলখ বলল—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওরা কি এ পড়ে এর মানে করতে পারবে।

হেসে আরডন বললেন—এটা হল আরডনের জট। আমার তো মনে হয় এর মানে শুরা করতে পারবে। দেখাই যাক।

তেমনি সমানেই মাথা চুলকাতে চুলকাতে হোলখ বলল—বেশ তাহলে যোগাযোগ করতে পারলেই ওদের আমি আপনার এ ছড়া শুনিয়ে দেব।—ভগবান জানেন ওরা কি বুঝবে এর থেকে?

ওর একথা শুনে হেসে উঠলেন আরডন। অনেকক্ষণ বাদে এমন করে হাসতে পারলেন।

হোলখ সে হাসি গায়ে মাখল না রেডিও চালিয়ে দিয়ে আবার ও চেঁচাতে সুরু করল···হ্যালো হ্যালো···

অনেক বেলায় গ্রাটেনকোর চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গল সকলের।—নবাব পুত্তুররা সব পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছেন।—এতটুকুও ভয় নেই কারও। সবাই যে বন্দী আমার হাতে—সে খেয়াল আছে!

ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল রাণা।— —আঃ কি বিরক্তই না করতে পারে লোকটা। সারাদিন এমন করে কথায় কথায় চেঁচিয়ে কি লাভ হয় ওর।—ও কি মনে করে সবাই ওর ঐ চিৎকার শুনে ঘাবড়ে যাবে?—

শান্তা এসে বলল—ক্যাপ্টেন তোমাকে ডাকছে শকুন্তলা।

—কেন? কোথায়? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—দেখবে এসে আমরা কি খুঁজে বার করেছি।

—কি হয়েছে? অবাক হয়ে রাণা মুখ তুলে তাকাতেই ঠোঁটের উপরে আঙ্গুল রেখে শান্তা ওকে চুপ করতে বলল। তারপর ইঙ্গিতে গুহার একটা কোণ দেখিয়ে ও এগোলো সে দিকে। অনেক কৌতুহল নিয়েই রাণাও এগোলো সে দিকে। গতকাল অন্ধকার হওয়ার পরেই এ গুহায় ঢুকেছে ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তখন সবার ভেঙ্গে পড়েছিল। কেউই কোন রকম কৌতুহল দেখায় নি এ গুহা সম্বন্ধে। আজ দিনের আলোয় রাতের সে গুহাকে যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। গুহার উপর থেকে সাদা চুনা পাথুরে রঙ্গের হাজার লক্ষ ঝাড় ঝুলছে। ছোট বড় অপূর্ব তাদের চেহারা। এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল ও হাজার ফাটলে ভরা। জায়গায় জায়গায় ফাটলগুলোর এক পাশের দেওয়াল এমনভাবে এগিয়ে এসেছে সামনে যে দেখলেই মনে হয় যেন সে দেয়ালের আড়ালে এ গুহার মতন অন্য একটা গুহা লুকান আছে। তেমনি একটা ফাটলের দিকে এগোল শান্তা। বেরিয়ে আসা দেওয়ালটা বেড় দিয়ে একটু সামনে এগোতেই অবাক হল রাণা। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একটু সরু মুখের সুরঙ্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। শান্তা বলল—এসো ক্যাপ্টেন ওটার মধ্যে ঢুকব আমরা।

—না দরকার নেই। বলল রাণা।—অন্ধকারে ভিতরে পথ হারাতে পারি।

—কোন ভয় নেই। হেসে বলল শান্তা—শকুন্তলা আর রুক্মিনী ওর ভিতরেই আছে।

—সে কি? ব্যস্ত হল রানা।—কেন ওরা না জিজ্ঞাসা করে গেল ওর মধ্যে? কাজটা ভাল হয় নি।

আর দাঁড়ালো না ও। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে ঢুকলো গুহার ভিতরে। চুপা এগোতেই সারা দিক যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দু'চার সেকেণ্ড থমকে দাড়াল ও। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতেই আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। না ভিতরে যতটুকু অন্ধকার ভাবা গেছিল ততটা নয় ফাটলের মুখ দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছে ভিতরটাকে সে আলোই আবছায়া করে তুলছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলো সুরঙ্গটা যেন বড় হয়ে যাচ্ছে। দুপাশের দেওয়াল গুলো সরতে সরতে হঠাৎ আবার একটা বড় ঘরের মতন জায়গায় এসে হাজির হল ওরা। ঘরেরই কোথায় যেন দাঁড়িয়ে ছিল রুক্মিনী আর শকুন্তলা। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে এল সামনে।

—এসেছো ক্যাপ্টেন? দেখবে এসো আমরা কি আবিষ্কার করেছি। এসো এদিকে। বলল শকুন্তলা।

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে চাপা গলায় ধমকে উঠল রাণা।—এমন করে এ গুহার ভিতরে তোমরা ঢুকেছ যে? জানো এতে বিপদ হতে পারতো। খুব অন্যায় করেছো তোমরা।

—সকাল বেলা হঠাৎ এ সুরঙ্গটা আমার নজরে পড়েছে। বলল শকুন্তলা।—তোমরা সবাই তখন ঘুমাচ্ছিলে। রুক্মিনী উঠতে ওকেও বললাম। শান্তাও শুনলো তখন। আমরা ঠিক করলাম দেখব ভিতরে কি কি আছে।—ঢোকার পথ গোলমেলে হলে আমরা ঢুকতাম না ক্যাপ্টেন।

—বেশ। এখন কি আবিষ্কার করেছ দেখি?—বলল রাণা

—এদিকে এসো। বলে একটা উঁচু পাথরের আড়ালের দিকটা দেখলাম শকুন্তলা

সেখানে গিয়ে সত্যি ভীষণ অবাক হল রানা। উঁচু পাথর আর দেওয়ালের মাঝখানে থাকে থাকে সাজানো রয়েছে মানুষের প্রয়োজনে লাগে এমন সব নানান জিনিস এমন কি সে সব জিনিসের মধ্যে প্লেন থেকে ফেলা গত কালের বহু জিনিসও রয়েছে।

—গুলি বারুদ বন্দুক আছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি ওসব কিছু নেই! আছে জামা কাপড়। আগুন জ্বালাবার জিনিস, কিছু ওষুধ পত্র আর বাসন কোসন। বহু জিনিস ব্যবহার না করার জন্য খারাপ হতে বসেছে। বলল রুক্মিনী।

—এটা তাহলে গ্রাটেনকোর গোপন ভাণ্ডার। বছরের পর বছর ওযে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তা শুধু এরই ভরসায়।

—তাই মনে হয় ক্যাপ্টেন। বলল শকুন্তলা

—কিন্তু বন্দুক গুলি বারুদ সে সব ও রাখে কোথায়!

—আমি আর রুক্মিনী এতক্ষন সমস্ত গুহাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। এছাড়া আর কোন জিনিস নেই এ গুহায়।

—হতে পারে হয়ত সে সব ও লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোন খানে।

—এত জিনিস ও পেল কেথা থেকে? অবাক শান্তা জিজ্ঞাসা করল।

ওর প্রশ্ন শুনে হাসল রাণা। বলল।—এতো অতি সহজ কথা। আস পাশের গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ করে এসব ও যোগাড় করেছে।

ক্যাপ্টেনের এ উত্তর শুনে মনে মনে সবাই শিউরে উঠল।

—চল আমরা সবাই ওখান থেকে ফিরি। ওর এসব জিনিষ আমরা কেউ ছোঁব না। কারও আর কিন্তু এখানে আসা হবে না। মনে থাকে যেন। গম্ভীর ভাবে বলল রাণা।

—আরও একটা জিনিস দেখাবার আছে।—হঠাৎ শকুন্তলার গলা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠল।

—কি জিনিস দেখি?

সামনে রাখা একটা ছোট কাঠের বাক্সের ঢাকনা তুলে ধরল শকুন্তলা। একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল রাণা তার ভিতরে খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখা আছে একটা ছোট্ট মেয়ের পরনের পোশাক। অতি সাধারণ কম দামী পোশাক। বহু পুরনো।

—আচ্ছা বন্ধ কর বাক্স। দু সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল রাণা।—দেখো তোমরা—কেউ যেন এখানে না আসে। না হাত দেয় ওর এই বাক্সে। এটার জন্য ও যা খুশি তাই করতে পারে।

অবাক শান্তা জিজ্ঞাসা করল—এ জামা কার ক্যাপ্টেন?

—ওর মেয়ের।—বলল রাণা। চল আমরা সবাই বাইরে যাই। সবার আগে শান্তা তার পিছনে ওরা এক এক করে বার হয়ে এলো সুরঙ্গ দিয়ে। এত বড় আবিষ্কারেও ওদের কোন লাভ হবে না। অন্যের জিনিষ ওরা ছোঁবে কেন!

ক্রমশঃ

কিমাশ্চর্য

মুক্তা মুখোপাধ্যায় গ্রাঃ সংখ্যা ৭৮৬—বয়স ১৪

লোহিত কণিকার ব্যাস ·০০৭ মিমি, ও পুরু ·০০২ মিমি। সুস্থ মানুষের দেহে থাকে ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ প্রায়। একটার পর একটা মালার মত সাজালে কণিকার দৈর্ঘ্য দিয়ে পৃথিবীকে আড়াই বার বেড় দেওয়া যেতে পারে।

(২) একজন মানুষের ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত যত জল ও খাদ্য সে উদরস্থ করেছে, ততখানি খাদ্য বস্তু নিয়ে যেতে গোটা কুড়ি ট্রাক লেগে যাবে।

(৩) ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটি তারা আছে যার ওজন সূর্যের ২·৮ গুণ। কিন্তু ব্যাসার্ধ পৃথিবীর অর্ধেক পৃথিবীর ১ গ্রাম জলের ওজন ওই তারার ৪ টন। এটা এমন পদার্থ দিয়ে তৈরী যার এতক্ষণ সেঃ মি ওজন ১৩৩২০০০০০০০০০ গ্রাম!

সাহায্য—জ্ঞান বিজ্ঞান মার্চ সংখ্যা—সংখ্যাদৈত্য প্রবন্ধ বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী।

ক্ষুদে গল্প

বন্ধন হালদার। ১৭০৬। বয়স—১৬

শোনা যায় স্কচম্যানরা নাকি বড় কিপ্টে হয়।

কোনো এক স্কচম্যান ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাবে ঠিক করেছে। একজন ট্যাক্সিওলাকে সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে তুমি কত নেবে?"

"মাত্র তিন শিলিং স্যার।" ড্রাইভার বললে। স্কচম্যান আবার বলল, "আমার মালপত্র আছে" সঙ্গে কিছু "মালপত্রের কোন ভাড়া লাগবে না" ড্রাইভার উত্তর দিল।

"তবে তুমি আমার মালপত্রগুলো স্টেশনে পৌঁছে দাও। আমি হেঁটেই যাব।"

গাছ

পলা সেনগুপ্ত

গ্রাঃ সং ২০৮৪—বয়স ১১ বছর

ইঁদুর

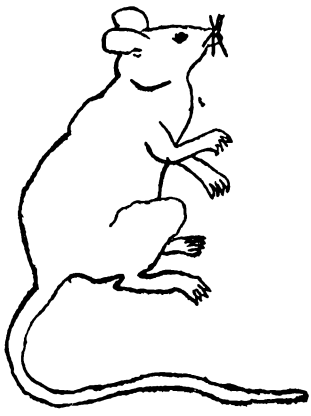

অনুরাধা সিংহ

গ্রাঃ সং ১৪৪৬—বয়স ১২ বছর

শীত

শুভ্রা বিশ্বাস

বয়স ১৪ বছর গ্রাঃ সং ২০২৯

শীত এলরে শীত এল
ওঠ্‌রে তোরা রাত পোহালো
বসতে দেরে পিঁড়ে
শালবনের ঐ ধারে ধারে
দোপাটিরা দুইছে ভারে
মৌমাছিদের ভিড়ে॥
ভিড় জমেছে খেঁজুর তলায়—
দল বেঁধে সব আগুন পোহায়
হিমেল হাওয়া ভাসে।
এদিক ওদিক ঐ অপরূপ
ঝরছে শিশির টুপ-টুপা-টুপ্‌
সবুজ ঘাসে ঘাসে॥
কড়াই শুঁটির ক্ষেতে ক্ষেতে
ঐ এলরে শীত যে মেতে
কুয়াসা দিল ঢেকে।
আয়রে শীত আয়রে আয়
সুদূর বনের হিমেল হাওয়ায়
ক্ষেতে আশীষ রেখে।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩½ বছর গ্রাহিকা সংখ্যা—১৪৫৮

নমি গো তোমায় হে বুদ্ধদেব প্রণমি বারংবার
ভারতের বুকে করিলে যে তুমি অহিংসা ধর্ম প্রচার
অজ্ঞ লোকেরে শিখালে যে তুমি "অহিংসা পরম ধর্ম",—
শান্তির নীতি দিয়ে যে সিদ্ধ হয় গো সকল কর্ম ॥
আজি এই শুভ জন্মদিনে তোমাকে আমরা স্মরি
অমর হইয়া রহিয়াছ কাছে, যাওনি কখনও মরি।

রেল চলে

অনিন্দ্য মিত্র

বয়স ১০ বছর গ্রাঃ সং ১৮৩৬

রেল চলে কুউ কুউ
রেল চলে ঝিক্,
রেল চলে ঘচা-ঘচ্
পৌঁছবে ঠিক ॥
মাঠের মধ্যে দিয়ে
চলে রেল গাড়ী।
যাত্রীরা ভাবে সব
যাব নিজ বাড়ি ॥
রেল চলে মাঠ দিয়ে
রেল চলে ঘাসে।
চাষীরা যে মেতে থাকে
নিজেদের চাষে ॥
মেঘেদের সাথে মেশে
কালো কালো ধোঁয়া।
বহুদূর উড়ে যায়
নাহি যায় ছোঁওয়া ॥
ছোট ছোট গ্রামগুলি
গাছ দিয়ে ঢাকা।
সরু সরু পথ গুলি
চলে আঁকা-বাঁকা ॥
মাঝে মাঝে থামে গাড়ি
ইষ্টি শানে
আকাশেতে কাল মেঘ
বৃষ্টি আনে ॥

ধাঁধার উত্তর

(১)

দেবাশীষ রক্ষিত

গ্রাহক সং ১৭০৫—বয়স ১১ বছর ৫ মাস।

নিউটন

(২)

উত্তমকুমার বটব্যাল

গ্রাহক সং ১৪৮১—বয়স ১২ বছর।

সজারু

নতুন ধাঁধা

মিত্রা রায়চৌধুরী

গ্রাহক সং ১৪২৫—বয়স ১৩ বছর।

(ক)

এমন একটা মাছের নাম কর যার পেট কাটলে পাখি হয়, মাথা বাদ দিলে নিচে যায় আর ল্যাজ কাটলে শুয়ে পড়ে।

(খ)

এমন একজন বিখ্যাত লোকের নাম কর যার নামের প্রথম দুই অক্ষর এক তীর্থ স্থানের নাম, মাঝের দুই অক্ষর অবতার আর শেষ দুটি চাকর।

(গ)

এমন একটি তরকারি যার প্রথম দু অক্ষর গায় দেয় আর শেষ দুটি শস্য।

'ডিটেকটিভ'

ঝিনুক চৌধুরী

বয়স—১৩ গ্রাহক নং—২৮৬৩

অনেকেরই গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ হবার শখ থাকে—বিশেষ করে যারা গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে। এই রকম আমার একজন বন্ধুরও শখ ছিল। তার নাম নীলাঞ্জন, তাকে নীলু বলেই ডাকি। নীলু সর্বক্ষণই নিজেকে ডিটেকটিভ মনে করত। একটা কথা বলতে হবে যে ডিটেকটিভের যে গুণ থাকা দরকার নীলুর সত্যিই তার কিছু কিছু ছিল। তাই আমরা ওকে সহজে ফাঁকি দিতে কিংবা ঠকাতে পারতাম না। এই ঘটনাটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনেছি।

একবার নীলুর মা বাবা একটা বিয়ে বাড়িতে গেলেন। তাঁরা ওকে ঘরের চাবি ইত্যাদি দিয়ে ওর ওপর ঘরের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। ওদের বাড়িটা ছিল দোতলা। নিচের তলায় নীলু, আমি আর আমাদের আরেকজন বন্ধু খেলছিলাম। নীলুর মা বাবা যখন গেলেন তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজে।

রাত সাড়ে আটটা বাজতেই আমিও আমাদের অন্য বন্ধুটি বিদায় নিলাম। নীলু ওদের নিচের তলার ঘরগুলো গুছিয়ে যে বই বা 'ম্যাগাজিন'গুলো আমরা ঘেঁটেছিলাম সেগুলো সাজিয়ে ওপর তলায় গেল। ওপরে গিয়ে নীলু ওর ঘরের দরজা খুলতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল কারা যেন ঘরের ভেতর চাপা গলায় কি বলাবলি করছে।

নীলু ছাড়া ওদের বাড়িতে আর কেউ ছিল না। নিশ্চয়ই চোর! ঐ ঘরে অনেক মূল্যবান জিনিস পত্র ছিল। নীলু পকেট থেকে ঘরের চাবিটা বার করে দরজায় চাবি দিয়ে দিল। চোরদের পালাবার আর কোনো পথ রইল না। দেয়াল ঘড়িতে নীলু দেখল ন'টা বেজে দশ মিনিট। টেলিফোন তুলে পুলিসকে খবর দেবার মিনিট দশেক পর পুলিস ও নীলুর মা বাবা একসঙ্গে উপস্থিত হলেন।

তাঁদেরকে সব বুঝিয়ে বলার পর নীলু চাবি খুলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে রইল দু'জন সার্জেন্ট ও

চারজন পুলিস। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কাউকেই ঘরে দেখা গেল না। পুলিস সার্জেন্টদের মধ্যে একজন খাটের ওপর একটা চালু অবস্থায় 'ট্রানজিস্টার' পেলেন। নীলুর হঠাৎ মনে পড়ল ওতো নিচে যাবার সময় ভুল করে ওটা চালিয়েই রেখে গেছিল।

তখন বোঝা গেল নীলু যে 'চাপা গলার আওয়াজ' পেয়েছিল তা 'ট্রানজিস্টার'এর থেকেই এসেছিল। সব বুঝে নীলু খুব লজ্জিত হ'ল। ওর মা বাবা সার্জেন্টদের বললেন যে তাঁরা যেন কিছু না মনে করেন। তাঁরা কিন্তু হাসিমুখেই নীলুর অসীম সাহসের প্রশংসা করলেন। তবু এই ঘটনায় নীলু এমন লজ্জিত হয়েছিল যে এরপর আর কখনো ওর 'ডিটেকটিভ' হবার বাসনা প্রকাশ করতে শোনা যায় নি।

তিলাইয়া ভ্রমণ

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

গ্রাহক নং—২০১৯ বয়স—৯½

১৯৬৮ সালের পূজোর ছুটিতে আমরা তিলাইয়া গিয়েছিলাম। যাবার কিছুদিন আগে বাবা আমাদের ডেকে বললেন "আমরা এইবার তিলাইয়া যাব"। তখন আমাদের আনন্দ আর দেখে কে টিকিট কাটার দিন থেকেই আমাদের খুব মজা লাগছিল। ভাবছিলাম কবে বুধবার আসবে? শেষে একদিন বুধবার এসে পড়ল, আমরা খেয়ে দেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। (আমরা বলতে ছিলাম বাবা, আমি, মা, বোন, পিসি পিসেমশাই, পিসতুতো দাদা, কাকা কাকীমা ও ছোট ভাই বাবুয়া।) যাই হোক আমরা হাওড়া স্টেশনে এলাম, সেখান থেকে ট্রেন চড়ে চললাম তিলাইয়া। পিছনে পড়ে রইল বরানগর রোড, দমদম, বর্ধমান, বরাকর প্রভৃতি স্টেশন। আমরা সঙ্গে যে লুচি তরকারী এনেছিলাম তাই দিয়েই ভোজনপর্ব সারলাম। কোনও একটি বড় স্টেশনে কাটলেট কিনে খেলাম। সবুজ কলার বন, সারি সারি নারকোল গাছ, কুলুকুলু শব্দে ছোট ছোট নদী ও ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আমরা যখন বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে বিহারে এলাম তখন সেখানে আর সবুজ বনানী নেই, সেখানে শুধু রাঙা মাটি। ক্রমে রাত্রি ৭টার সময় আমরা কোডার্মা স্টেশনে এলাম, সেখানে শুধু চারিদিকে কাঁচের মতন অভ্র। জ্যাঠা ছিলেন তিলাইয়ার বড় ডাক্তার তাঁর জীপ আমাদের নিতে এসেছিল। জীপে করে আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন দুধারে বন ও ঘুট্‌ঘুট অন্ধকার হেড্‌লাইটের আলো ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। এই বড় রাস্তার দুধারে শহরের মতো বিজলী বাতি নেই। ক্রমে রাত্রি নটার সময় আমরা রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছুলাম, সবাই ক্লান্ত বলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম, পরদিন সকালবেলা আমরা পাহাড়ের উপরে উঠলাম, দামোদর নদীর সেকি স্রোত। কি অপূর্ব তার দৃশ্য! এই দামোদর নদী বিদ্যাসাগর এক দুর্যোগের রাত্রে পার হয়েছিলেন! তারপর বাড়িতে এসে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে "ডিয়ার পার্কে" গেলাম, সেখানে ডিয়ার থাকে বলে সেইজন্য এই নাম। আমাদের বাড়ির সামনে একটি লন ছিল, সেখানে একটি ফোয়ারা ও অনেক ব্যাঙ ও শালুক ফুল ছিল।

সেদিন ছিল ষষ্ঠী, সেদিন দুপুরবেলা হাজারিবাগে গিয়েছিলাম, যাবার পথে রামগড়ের মহারাজার বাড়ি দেখেছিলাম, সেকি লম্বা প্রাচীর যেন আর শেষ হতে চায় না। তারপর আমরা ক্যানারি হিলসএ গেলাম, সেখানে অনেক ফুল আছে এবং অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, সেখানে আমরা অনেক ছবি তুলেছিলাম পরদিন আমরা পিক্‌নিক্ স্পটে গেলাম, সেখানে অনেক হরিণ ও সুন্দর ফুল আছে, একটি হ্রদও আছে, সেখানে আমরা অনেক ঝিনুক তুলেছিলাম ও দোলনায় দুলেছিলাম বিকেল-বেলা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম, সেখানে প্রসাদ নিয়েছিলাম। তারপর তিলাইয়ার সৈনিকদের ক্যাম্প দেখে বাড়ী ফিরলাম, অষ্টমীর দিন সমস্ত গোছগাছ করে নবমীর দিন বিকেলবেলা কলকাতায় রওনা দিলাম, তখন খুব মন খারাপ লাগছিল, আবার আমরা যখন কলকাতায় ফিরে এলাম তখন দুর্গাপূজার ঢাকের বাদ্যি বাজছে। তিলাইয়ার এই ভ্রমণ কাহিনী আমার মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

* তিলাইয়া বাঁধটা দেখ নি ?

রাজছত্র

মেঘমল্লার গুহ মজুমদার

গ্রাহক নং—৯০ বয়স—১৫

রাজামশাইএর একদিন ভীষণ জলতেষ্টা পেল। আর ভয়ানক তেষ্টায় তাঁর ছাতিটা গেল ফেটে।

রাজামশাই মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে এসে একটা ইটের পাঁজার ওপর বসলেন। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একটা বাদামওয়ালা, তাকে ডেকে একঠোঙা বাদাম কিনলেন, তারপর খেতে আরম্ভ করলেন।

হঠাৎ তাঁর কানে এল একটা ব্যাঁও ব্যাঁও আওয়াজ, তিনি রেগে উঠলেন, বললেন—'এই কেরে ওরকম আওয়াজ করছিস'।

উত্তর এল 'আমি 'ব্যাঙ, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে বলে তালপুকুরে বসে তানপুরা বাজাচ্ছি। রাজামশাই এই কথায় বাদামওয়ালার কাছ থেকে এক ঠোঙা বাদাম কিনে ব্যাঙকে খেতে দিলেন। ব্যাঙ তো খিদে মুখে তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে ফেলল। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে তুলল এক ম···স্ত ঢেকুর।

তারপর এসে আহ্লাদে গলায় রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা রাজামশাই আপনি এমন অসময় এখানে বসে কেন'। রাজামশাই বললেন 'আমার দুঃখের কথা আর বল না, তেষ্টায় আমার ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে, তাই মনের দুঃখে এখানে বসে আছি'।

ব্যাঙ তখন বললে 'এই কথা, চলুন আমার সঙ্গে আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি'।

এই বলে ব্যাঙ রাজামশাইকে নিয়ে একটা এক চাকার কোণা ভাঙ্গা রিক্সায় চড়ে খুট খুট করে তেপান্তরের মাঠের দিকে চলল।

খানিক পরে রিক্সা এসে পৌঁছল তেপান্তরের মাঠের মাঝে ছাতার কারখানায়। সেখানে ঘর ঘট্টাং ঘরঘট্টাং করে মেশিন চালিয়ে ব্যাঙেরা ছাতা তৈরি করছে।

ব্যাঙ সেখানে নেমে গুদামবাবুকে বলল 'গুদামবাবু, রাজামশাইকে একটা মস্ত ছাতা দিন। গুদামবাবু অনেকগুলো ছাতা এনে হাজির করলেন রাজামশাইএর সামনে। রাজামশাই একটা বড় লাল ছাতা পছন্দ করলেন। তারপর ব্যাঙকে নিয়ে একটা বেবি ট্যাক্সি করে এসে উঠলেন রাজবাড়িতে। তারপর খাজাঞ্চিকে বললেন 'খাজাঞ্চি ব্যাঙকে সব টাকা দিয়ে দাও।' খাজাঞ্চি ব্যাঙকে সব টাকা দিয়ে দিল। ব্যাঙ নাচতে নাচতে তালপুকুরে ফিরে গেল। আমার গল্পটাও শেষ হল।

মাদ্রাজ ভ্রমণ

শ্রীমতী গুপ্ত

গ্রাহক নং—৬৪৩ বয়স—১১ বছর

১৯৬৮ সাল ১৯শে ডিসেম্বর আমি, আমার ঠাকুমা ও আমার একজন দাদার সঙ্গে মাদ্রাজ মেলে রওনা হলাম, ট্রেনে ২ দিনের পথ, আনন্দে সময়টা যেন নিমেষের মধ্যে কেটে গেল। ২১শে ডিসেম্বর ভোরবেলা মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছুলাম, স্টেশনে আমার কাকা গাড়ি নিয়ে নিতে এসেছিলেন, আমরা কাকার বাড়িতে গেলাম কাকীমা আমাদের পেয়ে খুব খুসি হলেন। আমরা কাকিমার সঙ্গে বাড়ি ঘর সব দেখে জল খাবার খেলাম। আমরা রোজ রোজ শহরে ঘুরে ঘুরে কাকিমার সঙ্গে বেড়াতাম। এ দোকান ও দোকান দেখে বেড়াতাম খুব সুন্দর শহর, খুব পরিষ্কার। বাড়িতে আমি, ঠাকুমা ও কাকিমা খুব তাস খেলতাম।

আমার বাবা ও মা কাজের জন্য আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন নি। তাঁরা ১৯৬৯ সালে ১০ই জানুয়ারি হাজারিবাগ থেকে মটরে রওনা হয়ে, ১৩ই জানুয়ারি দুপুর বেলা মাদ্রাজ এসে পৌঁছলেন, সেইদিন বিকেল বেলা আমরা সকলে উডল্যাণ্ড হোটেলে খেলাম, তারপর মেরিনা বিচ দেখে এলাম। খুব ভাল লাগল আমি এর আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি।

তার পরদিন আমরা মাদ্রাজে আবাডি বলে একটা জায়গায় গেলাম। সেদিকে যত কারখানা সেই সব কারখানা দেখে এলাম। কারখানার ভেতরে ঢুকতে দেয় না। বাইরে থেকে সব দেখলাম। খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখে এলাম। ২১ তারিখে মা বাবা ও আমি মাইশোর, ব্যাঙ্গালোর, ও উটি বেড়াতে গেলাম মটরে। ব্যাঙ্গালোরে হাইগেট হোটেলে ছিলাম, মাইশোরে রাজার গেস্ট হাউসে ছিলাম উটিতেও রাজার গেস্ট হাউসে ছিলাম। ওখানেও খুব সুন্দর সব দেখলাম, মাইশোরে বৃন্দাবন গার্ডেন অতি চমৎকার সব দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

আমরা ওই সব দেখে ২৮ তারিখে মাদ্রাজ ফিরে এলাম। সেদিন আমায় কাকিমার বাড়িতে ছোট ভাইয়ের ষষ্ঠীপূজা ছিল। আমরা তাই নিয়ে খুব আনন্দ করলাম।

তারপর আবার আমরা ঠাকুমাকে নিয়ে ২রা জানুয়ারি মটরে রওনা হলাম ত্রিচি, মাদুরাই, ও ও রামেশ্বর দেখার জন্য। ওই দিন রাত্রে মাদুরাই হোটেলে ছিলাম, মাদুরাইতে মীনাক্ষী মন্দির অতি

চমৎকার। ৯টা চূড়া আছে মন্দিরে। ১০৯ ফিট উঁচু। এত চমৎকার দেখতে। কত যে ঠাকুরের মূর্তি চূড়ার ওপর বলা যায় না।

পরদিন ভোর বেলা আমরা রামেশ্বর দেখার জন্য রওনা হলাম। আমরা মান্দাপামা ক্যাম্প অবধি মটরে গেলাম, ওখান থেকে ট্রেনে গেলাম, সমুদ্রের ওপর পম্বান চ্যানেল পার হয়ে ট্রেন যায়। বাসের সেতুর ওপর দিয়ে রেলের ব্রীজটাকে (Adams Bridge) বলে। ওখানে গিয়ে আমরা রামেশ্বরের মন্দির দেখলাম।

ওখানকার সব মন্দির অতি চমৎকার, মন্দিরের সামনে একটা নন্দী বৃক্ষ আছে কি ভীষণ বড় সাদা পাথরের, কি চমৎকার দেখতে। মন্দির দেখে আমরা সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ বসে, ফের মাদুরাই এলাম। মাদুরাইতে সে রাতটা থেকে, আবার ভোরবেলা রওনা হলাম। আমরা ত্রিচিতে এলাম। ত্রিচিতে রক টেম্পল দেখলাম ৪৭০টা সিঁড়ি আছে। আমরা সবাই পুরোটা উঠলাম। পাহাড়ের মধ্যে কি সুন্দর মন্দির, ঠাকুরও খুব সুন্দর। সবচেয়ে উপরে গণেশের মন্দির। উপর থেকে ত্রিচি শহর দেখা যায়।

ওই দিন রাত ১০টায় আমরা মাদ্রাজ ফিরে এলাম। কদিন মাদ্রাজে থেকে, ঠাকুরমাকে কাকার কাছে রেখে আমরা আবার ১০ই ফেব্রুয়ারি মটরে হাজারিবাগ আসার জন্য রওনা হলাম।

প্রথম দিন আমরা রাত্রে বিজয়বাড়াতে হোটেলে ছিলাম। তার দিন ১১ই জানুয়ারি আমরা ওয়ালটেয়ারে হোটেলে ছিলাম। ১২ই আমরা গোপালপুরে, আমরা পাম্বানব্রীজ হোটেলে ছিলাম। গোপালপুরে আমরা খুব সমুদ্রে চান করলাম, খুব আনন্দ লাগল চান করে। ১৩ই তারিখে আমরা ভুবনেশ্বরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম। ওখানের মন্দিরে দেখলাম মহাদেব আছেন। ১৪ তারিখ রাত্রি ১টায় আমরা হাজারিবাগের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। আমি ১ মাস বেড়িয়ে ঘুরে খুব আনন্দ করে এলাম, এর আগে আমি এত দূরে কখনও বেড়াতে যাই নি।

আজব ভূত

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

গ্রাঃ সং ১১২৬—বয়স ১০ বছর

আমার মাসীর কাছে শোনা জ্যান্ত ভূতের গল্প বলছি। মাসী তখন দ্বারভাঙ্গার মেডিকেল কলেজে পড়েন!

……ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি এগারো বাজলো; তবুও একটানা পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে হোস্টেলের সব ঘর থেকে। সামনে পরীক্ষা।

কোণের একটি ঘরে একটি ছেলে পড়ে চলেছে। গতবার ভাল পড়া হয়নি তাই মন দিয়ে পড়ে চলেছে। অন্ধকার রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টেবিলের ওপর আছে একটা ল্যাম্প; আলোটা যত খাতা ও বই-এর ওপর পড়ছে। আলোটার পাশে রয়েছে একটা মাথার খুলি।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ খুলিটা কেমন নড়ে উঠল। ছেলেটি ভাবল, 'ও কিছু না'! সে নিজের কাজে মন দিল। আবার নড়ল, তার কেমন সন্দেহ হল ও মনে মনে একটু ভয়ও পেল। খুলিটা আরেকবার যেই না নড়েছে, অমনি সে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে—বাবারে—এ—যে—ভূত!'

ওর চীৎকার শুনে অন্য ছেলেরা ছুটে এল ওর ঘরে। সব কথা শুনে ওরা বলল, 'যত সব গাঁজাখুরি। আর কারুর কাছে এলনা, তোর কাছেই ভূত এল!'

কিন্তু হোটেলের পুরনো দারোয়ান বলে উঠল, 'এ বাত তো ঠিকই ছে। ইমহর বহুত ভূত ছে।'

একটি ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে আস্তে দারোয়ানের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে দিল এক বাড়ি খুলিটার ওপর। গেল ওটা উলটে। অমনি তার তলা থেকে দুটো ইঁদুর তিড়িং করে লাফ দিয়ে পালাল!!

আমার ছোট্ট ভ্রমণ

(ভ্রমণ কাহিনী)

শুভা মজুমদার

গ্রাহক নং—২২১৫ বয়স—১০ বৎসর ৮ মাস

হঠাৎ আমাদের ঠিক হইল যে আমরা বড়দিনের ছুটিতে চিতোর দুর্গ দেখিতে যাইব। ডিসেম্বর মাস। রওনা হইবার দিন খুব মেঘলা ছিল। বিকেলবেলার দিকে প্রচণ্ড বারিপাত শুরু হইল। দিল্লীর প্রচণ্ড শীত তার উপর বৃষ্টি। আমরা ভাবিলাম বুঝি আমাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। কিন্তু আমি জেদ ধরিলাম ও অগত্যা বাবাকে যাইতে হইল। স্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে বৃষ্টির জন্য ট্রেন একঘণ্টা দেরী করিয়া ছাড়িবে। ক্রমেই আমি অধৈর্য হইতে লাগিলাম। শেষে গাড়ি আসিলে আনন্দিত মনে গাড়িতে উঠিলাম। চলিতে চলিতে ভাবছিলাম যে আজ মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে যাইতেছি। পথে জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্টেশন পড়িল।

শেষে আমরা আজমীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেরিতে পৌঁছানের জন্য চিতোরের ট্রেন পাইলাম না। খবর লইয়া জানা গেল এর পর চিতোরের গাড়ী রাত্রে পাওয়া যাইবে। ফলে সারাদিন আজমীরে কাটান যাইবে, ভালই হইল। সঙ্গের মালপত্রগুলি 'লেফ্‌ট্ লগেজ' করিয়া, প্রাতঃরাশ সারিয়া, একটি টাঙ্গা লইয়া বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা গেলাম আনাসাগর লেকে। পৃথ্বিরাজের রাজত্বকালে এইখানে বহু রক্তপাত হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত আমলে এই হ্রদ প্রথম খনন করা হয়। পরে জাহাঙ্গীর এখানে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেন। শাহজাহান অনেক ছোট ছোট শ্বেতপাথরের ছত্রি নির্মান করিয়া এই জায়গাটিকে অতি মনোরম করিয়া তোলেন। পাহাড় এই হ্রদটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এই জায়গাটির দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার পর আমরা স্বর্ণ মন্দিরে গেলাম। এটি একটি জৈন মন্দির। মন্দিরটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। দেয়াল হইতে সুতা দিয়া ঝুলান একটি কাঁচের বাক্সে একটি নকল স্বর্গরাজ্য আছে।

ইহার পর আমরা আড়াই দিনেশে ঝোপরাত্রে গেলাম। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ কালে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এর পর আমরা গেলাম খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির কবর দেখিতে। প্রত্যহ এখানে বহু গরীব দুঃখীকে খাওয়ানো হয়। কার্ত্তিক মাসে এখানে উৎসব হয়।

সেই রাত্রেই আমরা চিতোর যাত্রা করিলাম ও রাত্রের মধ্যেই পৌঁছিলাম। রাত্রিটা আমরা রিটায়ারিং রুমে থাকিলাম। সকালবেলা স্নান প্রাতরাশ সারিয়া একটি টঙ্গা লইয়া চিতোর গড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

একটি পাহাড়ের উপর চিতোর দুর্গ। একএকটি করিয়া সাতটি ফটক পার হইয়া আমরা চিতোরের ধ্বংস স্তূপে পৌঁছিলাম। তখন একটি নির্দেশক আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন ও সব বুঝাইয়া দিলেন ভিতরে পদ্মিনী মহল, মীরাবাঈয়ের মন্দির, বিজয় স্তম্ভ, জৈন মন্দির, রাণাকুম্ভের মহল, গোমুখকুণ্ড ও পদ্মিনীকে যে ঘরে আয়না দিয়া আলাউদ্দিন দেখিয়াছিলেন সেই ঘরটি ইত্যাদি সব দেখিলাম যেখানে রমণীরা জহরব্রত করিয়াছিলেন, সেই জায়গাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে পদ্মিনীর ও বারো হাজার রমণীর আজও আছে বলা হয়। ফিরিবার পথে যেখানে আকবরের গুলিতে চৈত্ত মারা যান ও যেখানে আলাউদ্দিন তাঁবু গাড়িয়া ছিলেন, সেই জায়গাগুলি দেখিলাম।

সারাদিন চিতোরে কাটাইয়া রাত্রে ফিরিবার ট্রেন ধরিলাম। কিন্তু সে রাত্রে ঘুমাই নাই। চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিতেছিলাম সেই সব অতীতের কথা যা রাজকাহিনীতে পড়িয়াছি।

এই তব শুভ আশীর্বাদ!

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা৩২

Progressive/SW-46

(উত্তর দেবার শেষ দিন **২৮শে ফেব্রুয়ারি**)

(১)

অম্বরনাথ বাবুর বাড়ি চারটি কারিগর কাজ করতে এসেছে, তাদের নাম বলল পীতাম্বর, শ্বেতাম্বর, নীলাম্বর ও দিগম্বর। তারা কামার-ছুতোর রাজমিস্ত্রি ও রং-মিস্ত্রি, কিন্তু কোন জনের যে কি নাম তা তারা বলল না।

কথায় কথায় অম্বরবাবু জানতে পারলেন যে :—

(ক) শ্বেতাম্বর ও পীতাম্বর ফরসা হলেও দেখতে ভাল না।

(খ) কামারের হাতুড়িটা এমন ভারি যে নীলাম্বর ও পীতাম্বর দুজনে মিলেও সেটা বেশিদূর তুলতে পারে না।

(গ) রাজমিস্ত্রি আর রংমিস্ত্রি সমান রোজকার করে কিন্তু শ্বেতাম্বরের উপার্জন তাদের চেয়ে একটু কম।

(ঘ) রাজমিস্ত্রির পাকা চুলদাড়ি, কষ্টিপাথরের মত কালো রঙ, কিন্তু দেখতে সে সবচেয়ে সুপুরুষ।

(ঙ) কামারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি কিন্তু শ্বেতাম্বরকে সে পাঞ্জার জোরে হারাতে পারে না।

বল দেখি কার কি নাম ?

(২)

একটা শব্দের বদলে তার প্রতিশব্দ বসালে অনেক সময়ে অদ্ভুত ব্যাপার হয়, শব্দাংশের প্রতিশব্দ বসালে ত কথাই নেই, তখন বনভোজন হয়ে পড়ে জঙ্গলাহার! এইভাবে প্রতিশব্দ বসিয়ে নিচের লেখাটার অর্থ বার করতে পার কি ?

কুঠার পুস্তক-সময়ে আকাশ-শ্রেষ্ঠ অশীতি-ল সর্প মস্ত-শতের দোহন-কর-কর্ণে নবীন সাল-মুল্লুক অশীতি-বিদ্যমান। সং-ছাড়া পদই-মহিলা-ত্র আম্র-ই দোহন-কর-কর্ণে গোধূম-ন হস্তি-য়া দে-অর্গল-রসাল-কনিষ্ঠ-প্রকাণ্ড শিব-ইহা-ক প্রকাশিত-ই তা-পরাজয় তস-মহাযোদ্ধা মূল্য-সাল গজ-তেছে।

(৩)

(প্রত্যেক লাইনের দুটি শূন্যস্থানে এমন দুটি শব্দ বসাতে হবে যা পরস্পরের উল্টো, যেমন মাসী ও সীমা)

(ক) —পরে থাকে বুড়ো—ব্যথা পাছে হয়।

(খ) ভেজা—কিনি যদি—হবে নিশ্চয়।

(গ) শিখি হেসে ডেকে—বলে—ধ্বনি করে,

(ঘ) হেন—যার, কেন—ডুবে নাহি মরে।

(চ) মামাবাড়ি ভারি—আম—খাই ঢের।

(ছ) হাল—কিবা হাল হবে বল—কের!

(জ) —ফল বেচে যদু, কিছু—পায় রোজ।

(ঝ) —ধন—যাতে পেট ভরে খাবে ভোজ!

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১) (ক) কএর জায়গায় 'হ' আর 'ব' এর জায়গায় 'র' বসেছে।

(খ) আসল লাইনগুলি হল :—

হরিহর অহরহ হরষে হারা হয়ে হরিহরি গাহে। কে বলে কলিকালে কলিকাতায় কোলাকুলি কম চলে?

(২)

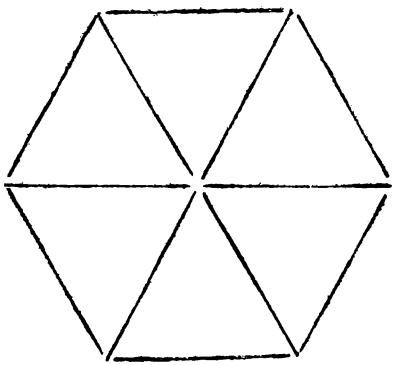

(৩) ১-২-৩-৪।

অগ্রহায়ণ মাসের উত্তর দাতাদের নাম :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ধাঁধার উত্তর লিখতে অনেক গ্রাহকই ১২টা পাখির নাম বার করতে পারেনি। যারা অন্ততঃ ৮।১০টা বার করেছে তাদের উত্তর 'প্রায় ঠিক' ধরা হল।

তৃতীয় ধাঁধার উত্তরে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাহক লিখেছে—বসু মহাশয় সাহিত্যিক, তাঁর ছেলে চিকিৎসক, স্ত্রী চিত্রকর, বোন গাইয়ে ও শ্বশুর অধ্যাপক। এতেও দেওয়া সর্তগুলি রক্ষা হচ্ছে কিন্তু তবু এই উত্তরটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

একটি উত্তরদাতার ভাষায় বলি—'বসু মহাশয়ের ছেলেই যখন সুদক্ষ চিকিৎসক, তখন বসু মহাশয়ের শ্বসুরের নিশ্চয় অনেক বয়স হয়েছে। এত বয়স অবধি অধ্যাপনা করা কি সম্ভব? শ্বসুর নিশ্চয় সাহিত্যিক।'

আমরা বলব একেবারে অসম্ভব না হলেও এরকম ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং এই উত্তরগুলিকে ঠিক না বলে 'প্রায় ঠিক ধরা হল।'

তিনটি উত্তর ঠিক :—

১৭৫ অনিতা রায়, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দী রায়, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১৩৬১ অনন্যা সরকার, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৪৯ কল্লোল রায়, ২৭৮৬ দীপঙ্কর রায়, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৭৫ ডলি দাশগুপ্ত।

দুটো উত্তর ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক :—

১ দীপংকর বসু, ৪৯ শর্মিষ্ঠা সেন, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা, শর্মিলা ও শ্রেয়া দত্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৩৬২ রাণা মজুমদার, ৩৭৯ অঞ্জনা সেন ও প্রজ্ঞা পারমিতা বসু, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা দেবাশীষ ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৩৯৭ ভারতী বসু, ৬১৪ স্নেহাশীষ ও দেবাশীষ হালদার, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৬২ অঞ্জন ও কুমকুম ভট্টাচার্য, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, ১২৩২ নন্দিনী দত্তমজুমদার, ১৩১০ আশীষ রহমান, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪৪৫ পার্থ প্রতিম গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জী, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন নীতীশরঞ্জন, সমীর গুহ, ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৮৬৩ সোনালি লাহিড়ী, ১৮৯০ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ১৯৯৪ মালা রায়, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জি, ২২০২ শুভাশীষ ধর, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৮০ নন্দিতা চৌধুরী, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ ২৪৭৬ শর্মিষ্ঠা সেন, ২৪৮৬ অভিজিৎ ও সরিৎ ভট্টাচার্য, ২৫২৯ দেবাশীষ দাস, ২৫৩৯ সুমিতা মিত্র, ২৫৫৪ দেবাশিষ ভট্টাচার্য, ২৫৯১ প্রবীর কুমার রায় চৌধুরী, ২৬১২ মিতালি সান্যাল, ২৬২৭ ইন্দিরা দাস, ২৬২৯ চৈতালি ও চিত্রাঙ্গদা বসু, ২৬৩০ সংযুক্তা বসু, ২৬৩১ সুতপা বিশ্বাস, ২৬৬৭ সোমা মিত্র, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৪৭ কেশব সেন, ২৮২৩ প্রসেনজিৎ কর ভৌমিক, ২৮৩৭ অর্পিতা রায়চৌধুরী, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি, তিনটী নম্বরহীন উত্তর, গ্রাহক কিনা বোঝা গেল না।

যাদের দুটো বা প্রায় দুটো উত্তর ঠিক :—

৯৮৩ ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার, ১২০৯ সুপর্ণ চৌধুরী, ১২৩৩ স্বাতী সিংহ, ১৪৪৬ অনুরাধা ও অভিজিৎ সিংহ, ১৭৯২ মলয়া ও মল্লিকা পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৩৯৩ মোহম্মদ আমীরুদ্দিন চৌধুরী, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯৫০ অঞ্জন ঘোষ, ২৯৫৫ তাপস শূর রায়।

দুইজন নাম-নম্বর হীন গ্রাহক।

যদিও ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন বছর গোনা আমাদের দেশের নিয়ম নয়, তবু নানান্ কারণে ঐ দিনটার একটা বিশেষত্ব আছে। এই সময়ই নতুন ক্যালেণ্ডার, নতুন ডায়রি দিয়ে আমরা নতুন বছর শুরু করি। তার উপর নতুন বই খাতা কিনে তোমরা নতুন ক্লাসে উঠে বস। তোমাদের সকলকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ১লা জানুয়ারির ভারি একটা আনন্দের আব-হাওয়া, সেই আনন্দ ধরে রেখো।

কেউ কেউ কার্ড পাঠিয়েছ, কি সুন্দর সব হাতে আঁকা কার্ড। কত খুসি হয়েছি বলতে পারি না, কত গর্ব হয়েছে।

মিত্রা রায় চৌধুরী, তপনকুমার বসু, নীপা গে স্বামী, দোলনচাঁপা চৌধুরী, সুতপা বিশ্বাস যে কার্ড পাঠিয়েছ আর একটা মোমবাতি আঁকা নাম-না-লেখা চমৎকার কার্ড আমাদের ঘর আলো করে রেখেছে। এবার চিঠির উত্তর।

(১) সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৮৯৪, বয়স ১২½

নাঃ, সবটা তাহলে ভালো করে শোননি। ভূতদের রাজার বরের মধ্যে আরো ছিল :—

'যা—চাই পরতে খাইতে পারি,
যেখানে খুসি যাইতে পারি।'

শোন নি বুঝি?

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ছবি সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া।

(২) গোপা পাল, ২৭৭৫,

রেগেমেগে বুঝি বয়সটাই দিতে ভুলে গেলে? লেখা ছবি ছাপাবার মতো হলেই তো আমরা ছাপি ভাই।

(৩) প্রদীপ কুমার হোর, ২৭৩৯, বয়স ১০

সে কি কথা! বিশেষ পূজা সংখ্যায় ছবিতে গল্প দেখ নি? আরো দেবার চেষ্টা করব। ভাইকে রাগতে মানা কর।

(৪) অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়, ১৪৫৮, বয়স ১৪

এতদিনে নভেম্বর সংখ্যা পেয়ে গেছ নিশ্চয় ? সত্যিই নানান্ কারণে পাঠাতে একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু তুমি তো আমাদের নিজেদের লোক, তাই নিশ্চয় চটে যাও নি ? কে বলেছে ধারাবাহিক গল্প আর লিখি না ? কেন, মাকুর পরেও গত বছর ধারাবাহিকভাবে 'নেপোর বই' বেরোয় নি বুঝি ? প্রফেসর শঙ্কু আর গোরিলার গল্প ভালো লাগে নি ? লেখা ভালো হলেই ছাপা হয় ভাই।

(৫) অমল বসু ২৯৪৫, বয়স ১২

গ্রাহক কার্ড পাঠিয়েছি, পেয়েছ আশাকরি। হাত পাকাবার আসরে নিশ্চয় গল্প পাঠিও। ভালো হলেই ছাপাব।

(৬) অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ১৪৬৬, বয়স ১৬ ও ১১

ঐ দেখ বোনটিকেও নিয়ে নিলাম। কার্ড পেয়েছ তো ? চিঠি লিখে, যথাসাধ্য উত্তর দেব। তবে যাদের ১৭ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, তাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না।

(৭) সায়ন্তন গুপ্ত, ২১৭৩, বয়স ১৪

তুমি যেমন বলেছ, সেইভাবেই গ্রাহক কার্ড পাঠিয়েছি, পেয়েছ নিশ্চয় ? লেখা ভালো হলেই ছাপাই। একটা না বেরুলে আরো ভালো করে আরো লিখে পাঠাবে। ম্যারাকট দ্বীপ সত্যি ভালো লেখা।

(৮) অমিত বাগচি, ২৬৭৪, বয়স ১৬

চিরকাল গ্রাহক থাকতে পার, তবে ১৭ পূর্ণ হলে আর প্রতিযোগিতা, চিঠিপত্র, হাতপাকাবার আসর ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারবে না। স্কুল ও ভালো কলেজও ভালো। পত্রবন্ধু চাই। শখ—ডাক টিকিট, হস্তলিপি (অটোগ্রাফ) সংগ্রহ।

(৯) সুপর্ণ চৌধুরী ১২০৯, বয়স ১১

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হয়েছিলাম। নিজে লেখো সে তো ভালো কথা। জেনে আরো খুসি হলাম। ছাপার ভুল-চুক মাঝে মাঝে হয়ে যায়, ভাই। ব্রাণ্টালুসির দুর্ঘটনার লেখকের নাম শিশির মজুমদার।

(১০) অর্পণ সেনগুপ্ত ২৭৯৯, বয়স ১৪

ভাই, ছোটদের জন্য কবিতা আরেকটু সহজ করে লেখ না কেন ? হতাশার চেয়ে উৎসাহের কবিতাই তাদের পক্ষে ভালো নয় কি।

(১১) শ্বেতন্তী পাল। ১৬৫৫, বয়স ১০

কার্ড পছন্দ হয়েছে তো ? শারদীয়া সংখ্যা ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

(১২) ২৫১৯ জুলু (সেন) নামের অর্ধেক, সংখ্যা কিছুই দাও নি কেন ?

(১৩) সুস্মিতা সেনগুপ্তা ? ১৩৭০, বয়স ১২

গুপী গাইন ভালো লেগেছে খুব ভালো কথা। হাত পাকাবার আসরের জন্য লেখা পাঠাও না কেন ?

(১৪) সুদীপ মৌলিক ২০৬৮, বয়স ১৪

ভাই, চাঁদা পাঠাবার সময় গ্রাহক সংখ্যা দাও নি। কাজেই আমাদের আপিস থেকে তোমাকে নতুন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই নতুন সংখ্যাই ব্যবহার কর। লেখা পাঠিয়ে দেখই না

(১৫) সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়, ২৭৭০, বয়স দাও নি কেন ?

(১৭) শুভ্রা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৪

তুমিও আমাদের সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ক্রিকেট

কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ দেখলাম। টেস্ট খেলা দেখছি সেই জার্ডিনের দলের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ থেকে। আমার একটা বদ অভ্যেস—যখন খেলা দেখি তখন প্রথম বল থেকে শেষ বল পর্যন্ত না দেখে মাঠ থেকে নড়ি না। ভালোমন্দ খেলা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সবই দেখেছি। বরং বলব এবছর ব্যবস্থাপনায় গলদ ছোটোখাটো দু'একটা থাকলেও মোটামুটি বেশ ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এমন মেরুদণ্ডহীন খেলা খুব কমই দেখেছি। বারে বারে মনে হয়েছে এই কি খেলা! এরাই তৃতীয় টেস্ট্ জিতে এল!

ছ'টি তরুণ প্রাণ চলে গেল ভীড়ের চাপে পদদলিত হয়ে তা মাঠে ঢুকে বুঝতে পারি নি। সবাই শান্ত। কর্তৃপক্ষও নীরব। তাদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে দু'মিনিট খেলা বন্ধ করে নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল। মারা যে গেছে তা জানলাম খেলার শেষে দশ উইকেটে হেরে যাবার পর।

তৃতীয় দিনে খেলার শেষে মাঠশুদ্ধ সকলেই বুঝেছিল ভারতের জেতার কোনো আশা নেই। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী সীমবোলিং এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের অফস্টাম্পের বাইরের বলে অহেতুক খোঁচা মারার অভ্যেসের জন্যে এই টেস্ট্ জেতা প্রথম ইনিংসেই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে গেছে। আর

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ভারতীয় খেলোয়াড়রা জোর শর্টপিচ বল হুক ও পুল মার মারতে ভুলে গেছে। সেই বলগুলো আটকেছে যেগুলো বাউণ্ডারি পার হবার কথা। এই ম্যাচের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিশ্বনাথকেও দেখলাম তিনটে ফসকাতে। সে তবু চেষ্টা করেছে। অন্যরা শুধু ব্যাট দিয়ে ঠেকিয়েছে।

ভারতের জেতা সুদূর পরাহত হলেও খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার মনোবলটা অন্তত আশা করেছিলাম। কোথায় সে দৃঢ়তা? চারদিনে খেলা শেষ!

গত সংখ্যায় তোমাদের কাছে একটু ভুল বলেছি। রেডিওতে গত দুই টেস্টের রিলে শুনে বলেছিলাম অশোক মানকড়ের খেলার মধ্যে বিজয় মার্চেন্টের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। মানকড়ের খেলা দেখে বুঝলাম আমার উক্তি কি নিদারুণ ভ্রমাত্মক। মার্চেন্ট নির্ভুলভাবে সুইংবল খেলতেন। মানকড় কি করে সুইংবল খেলতে হয় তা জানেই না।

বিশ্বনাথ হাজারের ছায়া নয় হাজারের উত্তরসূরী। বহুদিন পর ভারতীয় একজনের খেলা দেখে মন ভরে গেল। কলকাতার মাঠে দু'দলের মধ্যে বিশ্বনাথের ব্যাটিং-ই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল। এরকম ভালো স্কোয়ার ড্রাইভ দেখি নি বললেই চলে। ক্রিকেট খেলার যেসব গুণ থাকার দরকার তা বিশ্বনাথের আছে। এখন প্রয়োজন অভিজ্ঞতা। পঞ্চাশ থেকে ষাটের কোঠায় যেতে একটু নার্ভাস হয়। সে সময়ের খেলায় জুত করতে পারে না। সেটা প্রকট হয়েছে পঞ্চম টেস্ট্ মাদ্রাজে। কলকাতায় দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্বনাথ রান করতে না পারার জন্যে ভারতের অন্যান্য খেলোয়াড়রা খেলতেই পারল না। মনে হল নব খেলোয়াড়রা যেন বিশ্বনাথের মুখ চেয়েই ছিল। সে খেলতে পারলেই ভারতের মানমর্যাদা থাকবে। বিশ্বনাথ আউট হল যে বলে সে বলটা যে অত শেষে অমন সুইং করে ঠকবে তা সে আশা করেনি। ব্যাটটা ক্রস হয়ে গিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালটার্সের অনেক নাম শুনেছিলাম। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। আবার কিন্তু মনে হয়েছে ব্র্যাডম্যানের ছায়া কেন নখের যুগ্যিও তিনি নন। আমি অবশ্য ব্যাডম্যানের খেলা দেখিনি, যা দেখেছি তা সিনেমায় এবং যাঁরা ব্র্যাডম্যানের খেলা চাক্ষুষ দেখেছেন তাঁদেরও এই মনোভাব।

স্ট্যাকপোলের খেলা আমার ভালো লেগেছে। শীহান বেশি রান না করতে পারলেও খেলার বাঁধুনি আছে। চ্যাপেলও অবস্থানুযায়ী খুবই ভালো খেলেছেন।

একথা জেনে রাখো প্রসন্ন ও বেদীর মতো স্পিন বোলার পৃথিবীর কোনও ক্রিকেট খেলার দেশে নেই। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে খেলেছে, যেভাবে পিচের মাথায় গিয়ে বল আটকেছে তা কল্পনাতীত। খেলা দেখতে দেখতে অনেকসময় অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখে হেসে ফেলেছি। অস্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়দের খেলা বেশির ভাগ ডান-পা অর্থাৎ পিছনের পায়ে ভর দিয়েই জানতাম. এবার দেখলাম বাঁ-পা বাড়িয়ে ইংলিশ ক্রিকেট খেলতে।

পঞ্চম টেস্টও ভারত জেতা ম্যাচ হারল শোচনীয়ভাবে মাত্র ৭৭ রানে। জয়লাভ হাতের মুঠোয় এসে ফসকে গেল! অস্ট্রেলিয়ার ম্যালটের স্পিন বলে সকলে অযথা উইকেট হারাল। ইনজিনিয়ারের

দায়িত্বজ্ঞানহীন খেলা ভারতের হারার একটা কারণ। অধিনায়ক পতৌদিও তাঁর অধিনায়কোচিত খেলার কোনো চেষ্টাই করলেন না। মনে হল ভারতের সবাই যেন ফেস্টিভাল ক্রিকেট খেলছে, টেস্টম্যাচ নয়। ভারতের মানমর্যাদার কথা কেউ ভাবলই না। দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র ওয়াদেকার এবং গুণ্ডাপা বিশ্বনাথই যা কিছু খেলার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের বিদায় ৪ উইকেট ১১৯এর পর যে খেলা সবাই খেলল তা আর কহতব্য নয়। বাকি ৫২ রানে ৬টা উইকেট খতম হয়ে গেল। ইনজিনিয়ার-পতৌদি-সোলকার-মহীন্দার অমরনাথ সবাই মিলে মাত্র ১২৯ আর করতে পারল না। মনোবলহীন লজ্জাকর খেলা খেলে ভারতকে নিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত করল। ৬ দিনের খেলা শেষ হল চতুর্থ দিনের লাঞ্চের ৫৫ মিনিট পরে। এবারের টেস্ট্ পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া ৩-১ খেলায় জয়ী হল।

অস্ট্রেলিয়া ভারত সফরে ৩-১ জয়ে 'রাবার পেলেও বিল লরির দলের খেলা 'ব্রাইট ক্রিকেটের' আওতায় পড়ে না। বরং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের এই জয়কে বহু কষ্টে অর্জিত বলা যায়। বিল লরি যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেই বলেছিলেন 'আমি সব খেলায় জিততে চাই' সে আত্মবিশ্বাস তাঁদের সামগ্রিক খেলায় ফুটে উঠে নি। তিনটি টেস্ট ক্ষেত্রেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের চেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই বেশি ফুটে উঠেছে। অস্ট্রেলীয়রা সেই ব্যর্থতার সুযোগ নিতে পেরেছেন এইমাত্র। শেষ টেস্ট মাদ্রাজে ভারতের খেলোয়াড়দের সেই ব্যর্থতার ছবি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের সফর শেষে টেস্ট খেলায় ভারতের বর্তমান অবস্থা দাঁড়িছে এই—১১৬ খেলা ১৪ জয় ৪৯ পরাজয় ৫৩ ড্র।

স্কুলদল

সিংহল থেকে স্কুলদল এসে ভারত সফর করছে। সিংহল দলের সঙ্গে ভারত মোটেই এঁটে উঠতে পারছে না। ইতিমধ্যে তিনটি টেস্ট হয়ে গেছে। চতুর্থ টেস্ট কলকাতায়। একটী ছেলের খেলা দেখার ইচ্ছে আছে। সে উত্তরভারতের হংসরাজ ১৬ বছরের ছেলে। বোম্বাইতে প্রথস টেস্টে সে ১৭২ রান করেছিল। শুনেছি হংসরাজ বিশ্বনাথের স্টাইলে খেলে। স্কুলদলের অধিনায়ক বংলার রবি ব্যানার্জি।

বোম্বাইতে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় টেস্ট আমেদাবাদে ভারতীয় স্কুলদল হারে এক ইনিংস এবং ৯১ রানে। দিল্লিতে তৃতীয় টেস্টে ভারতীয়দল এই সর্বপ্রথম সিংহলের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। সিংহল ৮ উইকেটে ৩৩১ রান ক'রে ডিক্লেয়ার করলে ভারত জবাব দেয় ৯ উইকেটে ৪৪২ রান করে। হংসরাজ আবার সেঞ্চুরি করে। তার রান সংখ্যা ১৪২। খেলাটি ড্র যায়।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

প্রথম প্রাণের সাড়া

জীবন সর্দার

সেদিন কেউ সেখানে হাজির ছিলেন না। কোনো বিজ্ঞানী বলতে পারেন না 'ঠিক কেমন করে' 'প্রথম প্রাণীর' জন্ম হয়েছিল পৃথিবীতে—কেননা কোনো বিজ্ঞানীই সেখানে হাজির হয়ে দেখতে পারেন নি কি করে কি ঘটেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে যেমন একটি ধাঁধা, প্রাণের সৃষ্টি রহস্যও তেমনি আর একটি ধাঁধা। এতকাল বিজ্ঞানীরা বাদে আর সবাই অনুমান করে বলছেন কেমন করে প্রাণের শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন,—প্রাণের শুরু নিজেনিজেই। 'আদি মহাসাগরের' জলে যত ধাতু অধাতু ছিল বজ্রবিদ্যুতের আঘাতে সেই জল 'আয়নিত' হয়ে তা থেকে প্রোটোপ্লাজম বা জেলীর মত প্রথম জীব রূপ পেল। প্রাণী ও উদ্ভিদ সবকিছুই তা থেকে কোটী কোটী বছর ধরে জটিল এক ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে আজকের রূপ নিয়েছে।

যদি জিজ্ঞেস কর, সেই কালের প্রাণীদের গড়ন ধরনের কোন প্রমাণ আজকে হাজির করতে পারি কিনা, তবে বলব হ্যাঁ পারব। মাটি আর পাথরের গায়ে তাদের কিছু ছাপ রয়ে গেছে যে।

জলে যত প্রাণী আছে, মৃত্যুর পর জলের তলায় তাদের দেহ থিতিয়ে পড়ে, এটাই নিয়ম। জলের গাছপালার বেলায়ও সেই নিয়ম। জলের কেন, ডাঙ্গার গাছপালা পশুপাখির মৃতদেহও অনেক সময় বন্যার জলে ভেসে যায়। ডুবে যায়। একসময়ে না একসময়ে তারা জলের তলার কাদামাটির থিতোনো স্তরে চাপা পড়ে যেতে থাকে। আগ্নেয়গিরির গভীর তলায় চাপা পড়েছে এমন প্রমাণও আছে। পশুপাখির দেহের নরম অংশ নষ্ট হয়ে যায় বা অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলে, কিন্তু তাদের হাড়গোড়, দেহের শক্ত অংশ কিংবা গাছের ডালপালা এগুলো নষ্ট হয় না। হাজার, লক্ষ বা কোটী বছর ধরেও বালুমাটি কাদা কিংবা খড়িমাটির স্তরে অবিকৃত থেকে যায়। একসময়ে নদীর গতিপথ বদলে যায় যখন, শুকিয়ে যায় হ্রদের জল কিংবা সমুদ্র সরে যায় তীর ছেড়ে দূরে তখনই খোঁজ পাওয়া যায় ঐ সবের। শুনলে বিশ্বাস করবে না, অনেক উঁচু পাহাড়েও খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ঐ সব প্রাণীর নমুনার—যাকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল।

দেখেই বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন কোন যুগে কতকাল আগে পৃথিবীর মাটিতে কি ধরনের প্রাণী বা গাছপালা ছিল। কি ভাবে তাদের গড়ন বদলেছে যুগে যুগে। যুগে যুগে বদল হয়ে কি ভাবে সেদিনের প্রাণী আর উদ্ভিদ আজকের রূপ পেয়েছে তাও জানা গিয়েছে ফসিল দেখে। 'প্রথম প্রাণের সাড়া' যেদিন জেগেছিল সেদিন সেখানে হাজির না থেকেও, আজকের বিজ্ঞানীরা, উপকথা, লোকগাথা বা কল্পনার উপর নির্ভর না করেও প্রায় ঠিক ঠিক বলে দিতে পারছেন—পৃথিবী আর প্রাণের সৃষ্টি রহস্য।

ষাট কোটি বছর আগে পৃথিবী কেমন ছিল! তখনকার পৃথিবীর মাটি শূন্য খাঁ খাঁ করছে, বাকিটা অগভীর সমুদ্রের জল ঢাকা। প্রাণী বলতে যা কিছু সব জলের তলায় মাটির কাছাকাছি। ষাট কোটি বছরের পুরনো ফসিল পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেকালের মাটির গাছপালার আর জীবনের কিছু কিছু পরিচয় তা দেখেই তাঁরা বলতে পারছেন। সে কতকালের কথা, কী অনন্ত সময় পেরিয়ে গিয়েছে সামান্য এক কোষের প্রাণীর পরের ধাপে রূপ দিতে। আজকে যে ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী দেখি তেমন কিছু তখন ছিল না যেটা থেকে মাছ, মাছ থেকে উভচর, তারপর তা থেকে সরীসৃপ যারপর পাখি আর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে।

সেদিন যেখানে কেউ হাজির ছিল না 'প্রথম প্রাণীটি' যখন আলোয় গড়ে উঠেছিল। এখন আলোয় বা অন্ধকারে আমরা, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, অনায়াসে হাজির হয়ে দেখতে পারি প্রাণের লীলা। যা ছিল তার খবর জানবে যেমন, যা আছে তার খোঁজ নেবে না!

সফর ফ্রেজারগঞ্জ—সমুদ্রতীর

বিবরণ—**অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমরা যারা স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছি, অথবা যাদের ১৬ বছর হয়ে গেছে তারা এক সঙ্গে জীবন-সর্দারের সঙ্গে প্র. প. দপ্তরের 'সফরে' বেরোই।

এবার ডিসেম্বরে শীতের সফরে বেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ এবং নামখানা হয়ে এখানে পৌঁছেছি। পথে কিছু পাখি চোখে পড়েছে, যেমন, ফিঙে, নীলকণ্ঠ' বাঁশপাতি মেছোবক, কোঁচবক, এবং দু-রকমের মাছরাঙা।

সমুদ্রকে ডানহাতে রেখে তীর ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে চলেছি 'বকখালি'র দিকে, এখানকার তীর মাঝারি রকমের শক্ত, অবশ্য কোন কোন জায়গায় পা খানিকটা বসে যাচ্ছে, তীরের রঙ কালচে। মাটির ভাগ বেশি। সমস্ত তীর জুড়েই কাঁকড়ার গর্ত, এবং গর্তের পাশেই বসে লাল রঙের বড় কাঁকড়া। সংখ্যায় এত যে তীর লাল হয়ে আছে। আমরা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢোকে আবার খানিক পরেই বেরিয়ে আসে, খানিকটা এগোবার পরেই চোখে পড়ল বালিয়াড়ি, মোটামুটি উঁচু। জীবন সর্দার আগে বালিয়াড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, এখন সেই জিনিস নিজে চোখে দেখে ভাল

লাগল। আমরা বালিয়াড়িতে উঠতে লাগলাম। পুরো মিহি সাদা বালি, উঁচু দিকে কিছু লতা আছে। খাড়া গা বেয়ে উঠতে বেশ লাগছে। দু পা উঠছি, তারপরেই হয়ত তিন পা বালি সমেত নেবে আসছি। একভাবেই ওপরে উঠলাম। ওপর থেকে দেখলাম চারদিকে কিছু 'ক্যাকটাস' গাছ ও ডানদিকে কিছু নারকেল গাছ আছে।

সমুদ্রের অবস্থা বেশ ঠাণ্ডা, জলের রঙ নীলচে সবুজ, বহুদূরে হালকা নীল। দূরে ভাসছে জেলে নৌকো, এতক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি, হঠাৎ ভেসে এল শুঁটকি মাছের গন্ধ। দূরবীণে চোখ রাখতেই চোখে পড়ল সামনেই জেলেদের অঞ্চল। যতই এগোচ্ছি ততই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে গন্ধের জন্য। আস্তে আস্তে এসে গেলাম সেই অঞ্চলে, সেখানে প্রচুর জেলেনৌকা রয়েছে এবং প্রচুর মাছ। আরো একটা মজার জিনিস দেখলাম, প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে শুঁটকি মাছ শুকোচ্ছে, গাছের ডাল কেটে পুঁতে সারি সারি তাকের মত করে তার থেকে হাজার হাজার মাছ ঝুলছে, কিছু মাছ আবার বালিতে ফেলেই শুকোনো হচ্ছে। এইখানে বহু কাদাখোঁচা জলের ধারে ঘুরছে, ছোট বড় দু'রকমই আছে। আর দেখলাম অসংখ্য গাংচিল। দূরবীণ দিয়ে এবং খুব কাছ থেকে খালি চোখেও লক্ষ্য করলাম। কলকাতার গঙ্গায় যে গাংচিল দেখা যায়, তার পুরো মাথাই কালো এদের মাথায় খানিকটা কালো দাগ আছে। অসংখ্য গাংচিল একসঙ্গে জলে ভাসছে। একটা 'টার্ণ' পাখিও চোখে পড়ল, অনেকটা একরকম দেখতে, তবে লেজটা চেরা।

খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের পর ঘুরে দেখতে, নমুনা জোগাড় করতে আর ছবি তুলতে বেরোলাম। কিছু হাঙ্গরের বাচ্চা শুকোচ্ছে দেখে প্রশ্ন করে জানলাম যে, এদের থেকে তেল বার করা হয়। বক-খালির খাঁড়ি পেরিয়েই সুন্দরবনের 'বাদা'। সেখানকার গাছপালাও লক্ষ্য করলাম। চারদিক দেখে নিয়ে ফেরবার পথ ধরলাম, ফেরবার সময় দেখি বাঁশের মাথায় শঙ্খচিল বসে, সমুদ্রের ধারে সাদা কালো খঞ্জন পাখির দেখা পেলাম। ফেরবার সময় একটা কাঁকড়াও চোখে পড়ল।

সফর রূপনারায়ন নদীতীর

বিবরণ ঃ—অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

২১।১২।৬৯ এর সফর ছিল প্রপ দপ্তরের ছোট ছোট পড়ুয়াদের জন্য। তাতে আমি ছিলাম। কোলাঘাট থেকে রূপনারায়নের ধার ধরে এসে শরৎ সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। নীচে রূপনায়ায়ণ চওড়া হ'য়ে বয়ে চলেছে! বাঁদিকে বহুদূরে রূপনারায়ণ বাঁকে নিয়েছে! বাঁকের মুখে বেশ বড় একটা পলিমাটির চড়া পড়ে গেছে। নদীর জলে প্রচুর মাটি মিশে আছে, জলের রং একেবারে ঘোলা। জলের স্রোতও খুব কমে গেছে।

কূলের কাছে জলের মধ্যে একফালি চর গজিয়ে উঠেছে, আর সেখানে একটা বক দাঁড়িয়ে।

দূরবীনে চোখ লাগাতেই দেখলাম, বকটার পাশেই একটা কাদাখোঁচা পোকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তীরের নরম পলিমাটির ওপরে প্রচুর কাদাখোঁচা। বড় বড় চারটি আঙুলের ছাপ ফেলে হেঁটে গেছে বক।

সেতু থেকে নেমে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুধারে ছোট-বড় জলা জায়গা, আর আশে-পাশে নাম না জানা গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। চারিদিকে প্রচুর পাখি। দূরে কোথা থেকে একটা বেনে বউ পাখি ডেকে চলেছে—ফিউ—ফিউ। সাদা-কালো খঞ্জনগুলো একেবারে রাস্তার ওপর চলে আসছে। ঘাসের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ধূসর রঙের খঞ্জন। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাঁশপাতি বা নরুণচেরা পাখি। চকচকে সবুজ গা, লম্বা ঠোঁট।

হঠাৎ দেখলাম, অনেকগুলো পুকুরের মধ্যে একটার জল গাঢ় লাল। ভারী অদ্ভুত লাগল। জীবন সর্দার বললেন, জলে লাল রঙের শেওলা-জাতীয় পানা জন্মানোর জন্যই জলটা লাল দেখাচ্ছে। কাছে গিয়ে হাত দিলাম, পুরু শেওলা লেগে গেল। জীবন-সর্দার বললেন—যদি প্রশ্ন ওঠে এখানকার রাস্তা-ঘাট ও মাঠের ধুলো বালির জন্যই জলের রং লাল হয়েছে, কি যুক্তি এর বিরুদ্ধে দেখানো যেতে পারে?

আমরা আলোচনা করতে লাগলাম। প্রথমত দেখতে হবে, এখানকার সব পুকুরের জলই লাল হয়েছে কিনা, কারণ ধুলো-বা মাটি সব পুকুরের জলেই পড়বে। কিন্তু আমরা দেখলাম, লাল পুকুরটির পাশেই রয়েছে সাধারণ জলের পুকুর। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার মাটির রং কেমন দেখতে হবে। কারণ, মাটির রং লাল হ'লে তবেই পুকুরের জল লাল হ'বে।

কিছু দূর গিয়ে সাদা কালো মাছরাঙার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। একটা জলার ওপর দিয়ে উড়তে হঠাৎ ডানা বন্ধ করে ঝপ করে পড়ে জলের ওপর মাছধরার জন্য ছোঁ নেয়ে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে প্রচুর ঘুঘু ডাকছে। গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে তাদের দেখতেও পেলাম। টেলিগ্রাফের তারে ঘুঘুদের সঙ্গ দিয়েছে ফিঙে। জলের ধারে মেছো বক বসে। হাঁটতে হাঁটতে ফুরিয়ে এলো পথ। আমরা অবশেষে দেউলটি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

শীত এসে

শ্যামাপ্রসাদ দাস

শীত, শীত, বাতাসেতে খবরটা রটল।
ঠোঁট ফেটে চৌচির অঘটন ঘটলো॥
ঝুর ঝুর হিমকুঁড়ি জোট বেঁধে নামলো।
টিনে ছাওয়া ঘর রাতে দর্‌দর্‌ ঘামলো॥
সরিষার ক্ষেতে ফুল জোয়ারটা ছুটলো।
হাসিখুসি মুখ নিয়ে গাঁদাকলি ফুটলো॥
ছ্যাঁক ছ্যোঁক পিঠেপুলি ঘরে ঘরে চললো।
খেজুরের পাটালিতে শিশুমন ভরলো॥
লেপমুড়ি দিয়ে সবে তোফা ঘুমে জাঁকালো।
শীত এসে বুড়োদের হাড়ে হাড়ে কাঁপালো॥

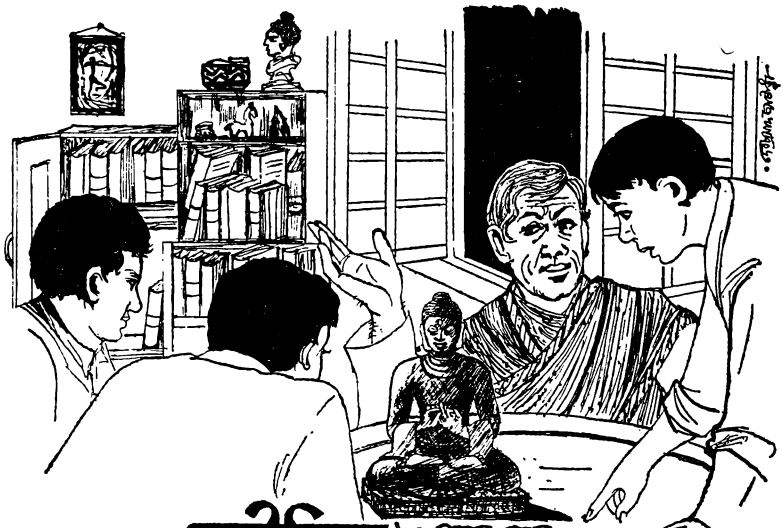

মরীচিকা

অজেয় রায়

দিলীপ বলল, একটা বুদ্ধমূর্তি দেখছি? আগে দেখিনি তো কখনো?

মাস্টারমশাই বললেন—হ্যাঁ, পাল আমলের মূর্তি। কষ্টি পাথরে তৈরি। তোমাদের দেখাব বলেই আজ এটা বের করে রেখেছি। ভারি সুন্দর না?

তিনজনে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

মাস্টারমশাইয়ের সমনে অর্দ্ধবৃত্তাকার লেখার টেবিলটার ওপর মূর্তিটা বসানো রয়েছে। প্রায় দশ ইঞ্চি উঁচু। পদ্মাসনে বুদ্ধ! চোখের পাতা আধবোজা। ধ্যানমগ্ন। প্রশান্ত মুখে ধ্যানের আবেশ। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

ধন্য, যে শিল্পী এই মূর্তি তৈরী করেছে। কি নিপুণ সূক্ষ্ম কারিগরি। কুচকুচে কালো মসৃণ পাথরের গায়ে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে। সাত আটশো বছরের পুরণো মূর্তি মনেই হয় না। তবে একেবারে অক্ষত নয়। এক হাতে তিনটি আঙ্গুলের ডগা ভেঙ্গে গেছে। ডান হাঁটুর কাছে চোটের দাগ।

অমর বলল—বাঃ চমৎকার। কোথায় পেলেন?

এক তিব্বতী লামার কাছ থেকে, মাস্টারমশাই বললেন। আজ আমার কিউরিওর সংগ্রহ ঝাড়পোঁছ করছিলাম, হঠাৎ মূর্তিটা চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অতীতের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। লামা চিমপোর কাহিনী। তোমরা ত এলেই গল্প গল্প কর, ভাবলাম সেই কথাই আজ বলি—

গল্প! তিনজনে নড়েচড়ে বসল।

আসলে রতনলালবাবু তিন বন্ধু কারোরই মাস্টারমশাই নন। সুনীলের মেজদা তাঁর ছাত্র। সেই সূত্রে তিনি সুনীলের বাড়ির লোকের এবং এই তিন বন্ধুরও মাস্টারমশাই হয়ে গেছেন।

অধ্যাপক রতনলাল রায় একজন প্রত্নতাত্ত্বিক। পুরোনো কালের ইতিহাস খুঁজে বের করাই তাঁর পেশা। এই কাজে কত দেশ ঘুরেছেন, কত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে! অমর, সুশীল, দিলীপ তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসে, সেই সব বিচিত্র কাহিনী শুনতে। সাধারণতঃ প্রতিমাসের তৃতীয় রবিবার তারা ওল্ড বালিগঞ্জের রতনলালবাবুর গাছপালা ঘেরা নির্জন বাড়িটার দোতালায় লাইব্রেরী ঘরে এসে হানা দেয়। নেহাৎ আটকে না পড়লে ঐ দিন ঠিক হাজির হবেই হবে।

অন্যদিন গল্প বলাতে মাস্টারমশাইকে কিঞ্চিৎ অনুনয় বিনয় করা প্রয়োজন হয়। আজ কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল। মাস্টারমশাই আজ মেজাজে আছেন।

টেবিলের পিছনে রিভলভিং চেয়ারটায় মাস্টার মশাই ছড়িয়ে আরাম করে বসলেন। মাস্টার-মশাইয়ের বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। কিন্তু একমাথা এলোমেলো সাদা ধবধবে চুল ছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ দেহে জরার কোনো ছাপ পড়ে নি। প্রশস্ত কপালের নিচে একজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ। একটুক্ষণ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি খোলা জানালা পথে দৃষ্টি ফেরালেন। সে দৃষ্টি যেন বহুদূরে। মন, বহুদিন আগের কোন স্মৃতিকে রোমন্থন করছে—

বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমেছে। ঘরের ভিতর জোরালো নিওন আলো। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরটায় র‍্যাকের পর র‍্যাক, বই ঠাসা। কাঁচের আলমারিতে সাজানো অজস্র প্রাচীন কিউরিও। সামনে বসে তিনজন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দেয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ ধ্বনি সময়কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

—সে আজ অনেক বছর আগেকার ঘটনা। মাস্টারমশাই তিনজনের মুখের পানে চেয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন—

গোবি মরুভূমির দক্ষিণ ধার ঘেঁষে এক ছোট্ট মরুদ্যানে আমরা ক্যাম্প করেছি। আমরা মানে আমি এবং অঁদ্রে ফুশে (Andre Faucher) ফরাসী ফুশে একজন প্রাণি বিজ্ঞানী। আমার অনেক দিনের চেনা। সে গোবি মরুভূমিতে খুঁজতে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর অস্তিত্ব অর্থাৎ ফসিল। আমার লক্ষ্য পুরনো লুপ্ত সভ্যতা। সেই জনহীন মরুপ্রদেশে একা কাজ করার অনেক অসুবিধা। দু'জনে মিলে দল গড়লে খরচা কম। আপদে-বিপদেও ভরসা পাওয়া যায়। তাই আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। মরুদ্যানটি বেছে নিয়েছি এমন জায়গায়, যেখান থেকে আমাদের দু'জনেরই কাজের সুবিধে হয়।

ছোট্ট মরুদ্যান। চারপাশের ধূসর অনুর্বর রাজ্যে যেন একবিন্দু প্রাণ। দুটো গভীর কুয়োকে ঘিরে কিছু ঝোপ-ঝাড় গাছ। কিছু সবুজ ঘাস সেখানে মানুষ বলতে আমাদের লোকজন আর ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা দু'ঘর মঙ্গোল্। জায়গাটা একসময় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। অনেক লোক বাস করত। গাছপালা বাগান ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ক্রমে জল দিনে দিনে তলায় নেমে যায়। বেশীর ভাগ কুয়ো

যায় শুকিয়ে। ফলে সবাই পালিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে ঐ দু'ঘরও চলে যাবে। মরুভূমি পুরোপুরি গ্রাস করবে এই মরুদ্যানকে।

আমি খুঁড়ছি একটা ধ্বংসাবশেষ। ক্যাম্প থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে প্রাচীন বাণিজ্য রাস্তা রেশম পথের ধারে। মধ্যযুগে ওখানে এক ছোট খাটো শহর ছিল। সমস্ত ঘর বাড়ি প্রাসাদ এখন মাটি বালির তলায় চাপা পড়েছে।

—কি নাম বললেন? রেশম-পথ! দিলীপ জিজ্ঞেস করে। কেন?

কারণ ঐ পথে রেশম চালান যেত। মাস্টারমশাই বলেন।

এই দেখ ম্যাপ! মাস্টারমশাই একটা লম্বা সরু লাঠি তুলে নিলেন। তারপর রিভলভিং চেয়ারটায় পাক খেয়ে দিলীপদের দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসলেন। দেয়ালে তাঁর মাথার কাছে কয়েকটা বড় বড় ম্যাপ টাঙ্গানো। নানা দেশের মানচিত্র। একটা এশিয়ার ম্যাপের ওপর লাঠির ডগাটা ছোঁয়ালেন। হিমালর পর্বতমালার একটু উপর অংশে।

—এই হচ্ছে মধ্য-এসিয়া।

পশ্চিম ও উত্তর সীমানায় থিয়েনসান পর্বতমালা, পশ্চিম পামির ও কারাকোরাম, দক্ষিণে কুন্ লুন পর্বত শ্রেণী দিয়ে ঘেরা। লাঠি দিয়ে একটা সীমানা কাটতে কাটতে মাস্টারমশাই বললেন—এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমি। মধ্য এসিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। লম্বায় প্রায় হাজার মাইল। চওড়ায় তিনশো—পাঁচ মাইল হবে। আর গোবির মধ্যে এই ছোট্ট নীল ছোপটা হচ্ছে লব-নোর অর্থাৎ লবন হ্রদ।

ম্যাপে এই যে দুটো টানা লাল দাগ দেখছো পূব পশ্চিমে বিস্তৃত এগুলো হচ্ছে সেকেলে বাণিজ্য রাস্তা দেখ, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমানায় হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে কয়েকট ছোট ছোট রাস্তা গিয়ে কাশগরে মিলেছে। সেখান থেকে দুটো প্রধান রাস্তা বেরিয়েছে। একটা গেছে গোবি মরুভূমির দক্ষিণ অংশ দিয়ে, অন্যটা উত্তর অংশ দিয়ে। এই দুই রাস্তাকেই বলা হত রেশম পথ। এই দুটো পথ আবার মিলেছে চীনের উত্তর পশ্চিম সীমানার কাছে ইউ-মেল-কোয়ান গিরিপথে। প্রাচীনকালে এই পথে দেশ বিদেশের বণিকরা আসা যাওয়া করত। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস রোম রাশিয়া ইত্যাদি দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত! চীন থেকে চালান যেত অতি উৎকৃষ্ট পৃথিবীর সেরা রেশমী কাপড়। ফলে রাস্তাগুলির নাম হয়ে যায় রেশম পথ। এ সব রাস্তা ছিল বড়ই দুর্গম। কখনও মরুভূমি, কখনও গিরিপথের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। শত শত মাইল ব্যাপী অনুর্বর উষর পথ অতিক্রম করতে হত বণিকদের—কখনও বালির সমুদ্র,কখনও ন্যাড়া পাথুরে প্রান্তর, কখনও বা ছোট ছোট ঘাসের স্টেপ্ ভূমি।

পথে কোন গ্রাম-শহর কিছুই ছিল না বুঝি? অমর প্রশ্ন করে।

—তা ছিল। উত্তর আর দক্ষিণ পথের ধারে ধারে অনেক দূরে দূরে এক একটা মরুদ্যানকে কেন্দ্র করে বা পাহাড়ী নদীর পাশে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগ অবধি এই রাজ্যগুলি ছিল বেশ সমৃদ্ধিশালী এসিয়া ইউরোপের নানা ধর্ম সংস্কৃতি এই রাজ্যগুলিতে বয়ে এনেছিল বণিক আর

ধর্মপ্রচারকের দল। ভারতবর্ষ থেকে প্রধানতঃ গিয়েছিল বৌদ্ধধর্ম এবং শিল্প-সাহিত্য। কিন্তু ক্রমশঃ মরুভূমির আয়তন বেড়ে যাওয়ার আবহাওয়া দিন দিন শুকনো হয়ে ওঠায় এই রাজ্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আমি দক্ষিণবাহী রেশমপথের পাশে সে রকম একটা রাজ্যেরই ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বের করছিলাম। যাক্ মধ্য এসিয়ার ইতিকথা আর একদিন হবে, এখন আসল গল্পে আসা যাক।

আমি এবং ফুশে দু'জনে দুটো টিম করে নিয়েছিলাম। আমার কাজের জায়গায় কথাতো আগেই বলেছি—কাছেই। কিন্তু ফুশে যেত দূরে। মরুদ্যান থেকে কিছু উত্তরে এক নিচু পাহাড়ের সারি পূব-পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে ফুশে সেই পাহাড়ের কাছাকাছি, পাদদেশে এবং উপত্যকা অঞ্চলে ফসিলের সন্ধান করছিল। কোন কোন দিন বেশি দূরে চলে যেত তখন সঙ্গে লোকজন, তাঁবু, খাবার নিয়ে বেরত। ফিরে আসত কয়েকদিন পরে।

প্রায় মাস খানেক কাজ চলেছে। একদিন ভোরবেলা। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। সবে উষার আলো ফুটেছে। চতুর্দিকে দিগন্ত প্রান্তর আর ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি সূর্যের প্রথম রশ্মিতে রক্তিম হয়ে উঠেছে। বড় সুন্দর দৃশ্য।

ভাবলাম থাক আজ আর কাজে বেরব না। ফুশে নেই। সে তার টিম নিয়ে বেরিয়েছে। খুব সম্ভব কাল ফিরবে। ক'দিন পর পর প্রচণ্ড গরমে ধ্বংসস্তূপে খোঁড়াখুড়ি করে আমি ও আমার দলের লোকেরা বেশ ক্লান্ত। তাই একদিন বিশ্রাম নিই। তাছাড়া যে প্রাসাদটি খুঁড়ে বের করছিলাম, সেখান থেকে অনেকগুলো মুদ্রা শিলালেখ পেয়েছি, সেগুলো আজ ক্যাম্পে বসে পরীক্ষা করি!

কাজে ফাঁকি দেবার নামে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি মরুদ্যান থেকে প্রায় দু'মাইল পশ্চিমে একটা নিচু প্রান্তর ছিল। সেই প্রান্তরে এক বিন্দু বালি নেই। শুধু কঠিন ন্যাড়া পাথরে ঢাকা। যেন এক মস্ত বাঁধানো সমতল চত্বর। আর তার ওপর ছড়িয়ে আছে অজস্র গোল গোল নুড়ি। নুড়িগুলির বেশী ভাগেরই রঙ সবুজ। গাঢ় সবুজ, হালকা—নানা রকম। তাছাড়া ছিল হলুদ আর ফিকে লাল রাঙা পাথর। ভারি সুন্দর দেখতে প্রান্তরটা। সূর্যের আলো পড়ে দেখতে যেন একখণ্ড সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, তাতে, হলদে-গোলাপী রঙের ফুল ফুটে আছে। সময় পেলেই আমি সেখানে যেতাম। দেখে দেখে সুন্দর সুন্দর কুড়ি কুড়তাম, ফুশেকে রসিকতা করে বলতাম—বাগানে চললাম হে বেড়াতে।

আমরা লোকদের বললাম—আজ ছুটি। তারপর দূরবীন ও জলের ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেই প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম

একাই গেলাম, সামান্য দূরত্ব পথ হারাবার ভয় নেই। আর ততদিনে ধারকাছও মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে।

—'বাগানের কাছাকাছি পৌঁছেছি হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কতগুলো শকুন। বেশ নিচে নেমে এসে চক্রাকারে উড়ছে। সেই বাগান বা প্রান্তর যাই বল, সেইখান থেকে আন্দাজ মাইল খানেক তফাতে।

একটা উঁচু টিলার ওপর উঠলাম দেখতে।

হুঁ, যা ভেবেছি। একটা দেহ বালির ওপর পড়ে। চোখে দুরবীন লাগালাম।—মানুষ।

কোন হতভাগ্য কে জানে? হয়তো মরুরাজ্যে পথ হারিয়েছিল। জল আর খাবারের অভাবে রাতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা এবং দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্যতাপে একটু একটু করে যাতনাময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

একি দেহটা যে নড়ে উঠল। তবেতো প্রাণ আছে। নুড়ির কথা ভুলে দ্রুত লোকটির দিকে পা চালালাম।

দেখে মনে হল কোন বৌদ্ধ শ্রমণ। মুণ্ডিত মস্তক। মঙ্গোলীয় গড়ন। গায়ে একটা লাল রঙা লম্বা আলখাল্লা। বিবর্ণ শতছিন্ন। পাশে একটি কাপড়ের ঝুলি পড়ে আছে। ক্রমশঃ

পুরনো সন্দেশ

শেষ হবার আগে তাড়াতাড়ি কিনে নাও।

মূল্য—সম্পূর্ণ বছর	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৬৮ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র নাই)	১৲	২৲
১৩৬৯ (বৈশাখ নাই)	২৲	৩৲
১৩৭০ (সম্পূর্ণ বৎসর)	২·৭৫	৪৲
১৩৭১ (আষাঢ় নাই)	৩·৭৫	৫৲
১৩৭২ (কার্ত্তিক নাই)	৪·৭৫	৬৲
১৩৭৪ (শ্রাবণ নাই)	৪·৭৫	৬৲
১৩৭৪ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৫·৭৫	৭৲
১৩৭৫(সম্পূর্ণ বছর)	৫·৭৫	৭৲

দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আট বৎসরের সন্দেশ একসঙ্গে কিনলে যথাক্রমে ১-২-৩-৪-৫-৬ বা ৭ টাকা রিবেট পাওয়া যাবে।

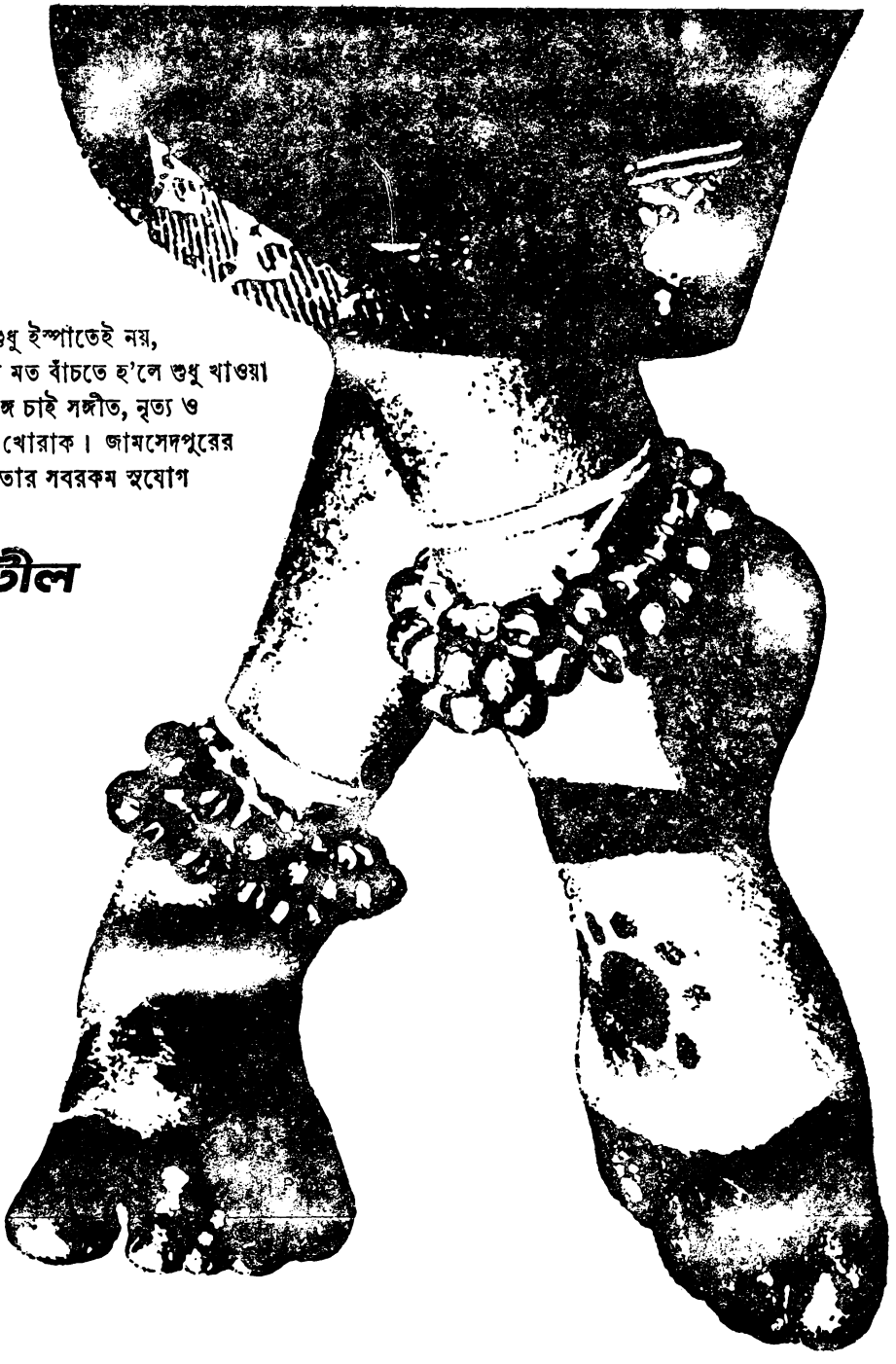

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়,
মানুষেও। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে শুধু খাওয়া
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই সঙ্গীত, নৃত্য ও
অন্যান্য আনন্দের খোরাক। জামসেদপুরের
নাগরিক জীবনে তার সবরকম সুযোগ
সুবিধা আছে।

টাটা স্টীল

TS 7050AR

প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স —সত্যজিৎ রায়।

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সৌরভ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com